আঁধার রাতের বন্ধু

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

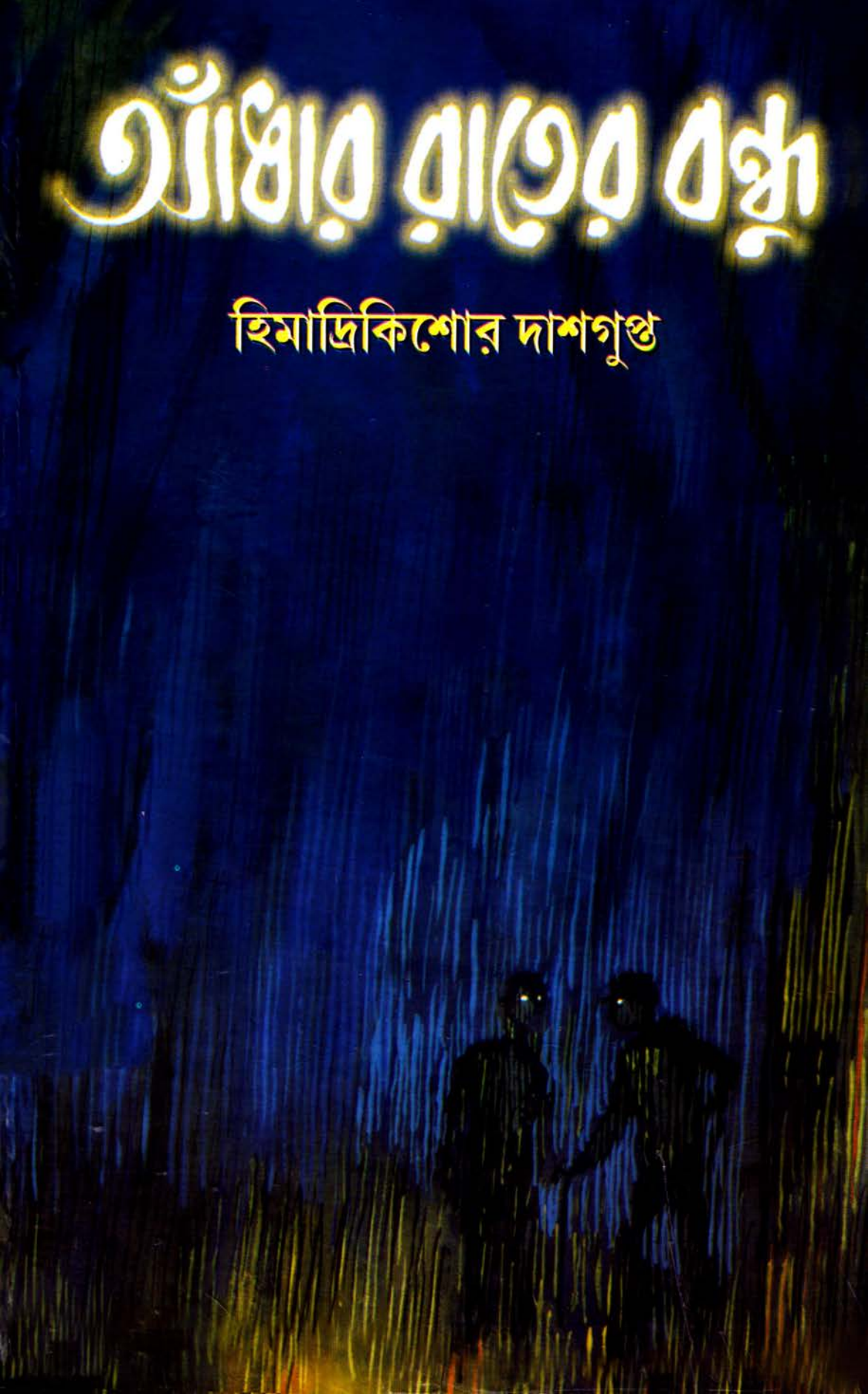

আঁধার রাতের বন্ধু

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

শিশু সাহিত্য
সংসদ

AANDHAR RATER BANDHU
(Ghost Stories)
by Himadrikishor Dasgupta

ISBN 978-81-7955-186-8

© **পাঠ্যবস্তু** লেখক
পুস্তকসজ্জা ও অলংকরণ প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশক
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
নটরাজ অফসেট
১, নিরঞ্জন পল্লি, তেঁতুলতলা
কলকাতা-৭০০ ১৩৬

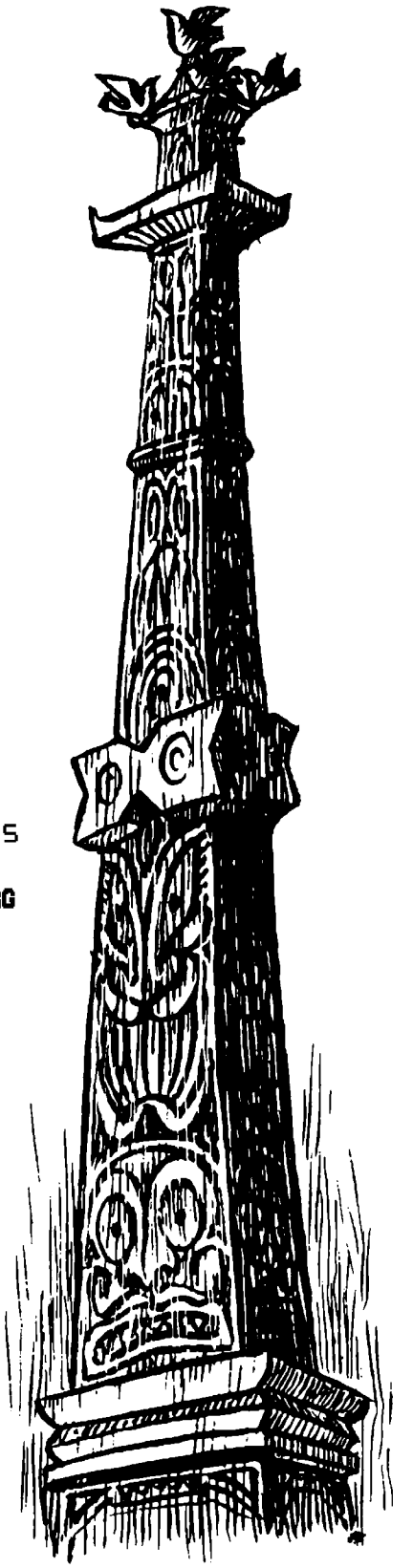

উৎসর্গ

আমার মেয়ে ও তার সব বন্ধুরা—
মেঘনা গঙ্গোপাধ্যায়, সবুজ গঙ্গোপাধ্যায়,
কুইন্সি টিকাদার—এদের জন্য।

সূচি

বিকেলের আলোয় ১

শ্রাঙ্কেন হেড ১৫

সাত নম্বর খাদান ৩৬

জগবন্ধুর হারমোনিয়াম ৪৯

ধূর্জটিবাবুর প্ল্যানচেট ৬২

মৃত্যুযোগ ৭৬

আঁধার রাতের বন্ধু ৮৯

বিকেলের আলোয়

আজ নিয়ে ঠিক নব্বই দিন হল, গোমেজ ফিরল না—মনে মনে এই কথা বলে, পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমার কাচ মুছে লাঠি হাতে আবার হাঁটতে শুরু করলেন জনদাদু। পথের দু-পাশে সার সার সমাধি। তার মধ্যে কয়েকটির বয়স কয়েকশো বছর। সমাধির উপর শ্বেতপাথরের চাদরগুলো ভেঙেচুরে গিয়েছে, তার নীচে থেকে ইটগুলো উঁকি মারছে।

সন্ধ্যে নামবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। বেরিয়াল গ্রাউন্ডের উঁচু প্রাচীরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে সমাধির উপর দাঁড়িয়ে থাকা ক্রসগুলোর গায়ে। চারদিকে শান্ত পরিবেশ। ব্রিটিশরা যখন এদেশে এসেছিল, সেই আমলের সমাধি এটি। জনদাদুর পিতা-পিতামহ, এ গ্রামের চেনা-অচেনা অনেক মানুষই আজ ঘুমোচ্ছেন ওই সমাধির তলায়। জায়গাটা বড়ো প্রিয় জনদাদুর, এখানে এলে মনে হয়, তাঁর চেনা যেসব মানুষ ঘুমোচ্ছেন ওই সমাধির নীচে, তাঁদের সান্নিধ্য যেন উপভোগ করতে পারেন তিনি। কত মুখ, কত স্মৃতি ভেসে ওঠে ঘষা কাচের আড়ালে ঢাকা জনদাদুর চোখে। তা ছাড়া এখানেই একটা ছোট্ট ঘরে বাস করেন জনদাদুর সত্তর বছরের পুরোনো বন্ধু বৃদ্ধ গোমেজ। বিশেষত, তাঁর টানেই অনেক বছর ধরে রোজ বিকেলে এখানে হাজির হন জনদাদু। তিনি চলে যাওয়ার আগের দিনও প্রতিদিনের মতো বিকেল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁরা।

যাওয়ার আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই গোয়া থেকে ফিরে আসবেন। কিন্তু এখনও তিনি ফেরেননি। সমাধিক্ষেত্রে ঢোকার পর ডান পাশে যে ছোট্ট ঘরটা আছে, রোজ বিকেলে এসে সে ঘরটার দরজার দিকে বড়ো আশা নিয়ে তাকান জনদাদু। কিন্তু সে ঘর তালাবন্ধ থাকে। মনে মনে একবার হিসেব করে নেন ঠিক কতদিন হল, তারপর

BanglaBook.org

আবার হাঁটা শুরু করেন। সন্ধ্যে নামার আগে পর্যন্ত তিনি একলাই ঘুরে বেড়ান বিরাট এই সমাধিক্ষেত্রের চারপাশে। তারপর এই আশা নিয়ে ফিরে যান, নিশ্চয়ই কাল বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে। গোয়ায় ভাইপোর বাড়ি থেকে নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন তিনি।

সেদিনও একলাই হাঁটতে লাগলেন জনদাদু। সমাধিক্ষেত্রের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে সামনের দিকে। ক-দিন হল বর্ষা নেমেছে, এর মধ্যেই লম্বা লম্বা ঘাস জন্মে গিয়েছে রাস্তার পাশে আর সমাধিক্ষেত্রের ফাঁকে। গোমেজ নেই, তাই ঘাসগুলো পরিষ্কার করার লোকও নেই। গোমেজই এই সমাধিক্ষেত্রের রক্ষক। তিনি সমাধিক্ষেত্রের মাটি খোঁড়েন, এই স্মৃতির বাগানে যেসব ছোটো-বড়ো গাছ আছে তাদের পরিচর্যা করেন, জঙ্গল সাফ করেন, এককথায় তিনিই হলেন এখানকার সব কিছু।

হাঁটতে হাঁটতে জনদাদু এসে হাজির হলেন সমাধিক্ষেত্রের শেষ প্রান্তে। প্রাচীরের ধারে দুটো বিরাট দেবদারু গাছ কয়েক হাত দূরত্বে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বয়স মনে হয় জনদাদুর চেয়েও বেশি। ছেলেবেলা থেকেই গাছ দুটোকে একইভাবে দেখে আসছেন তিনি। পাশাপাশি ওই গাছ দুটোর নীচেই ঘুমোবেন দুই বন্ধু। এ-ব্যাপারটা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন তাঁরা। বয়স তো দু-জনেরই কম হল না। আশি পেরিয়ে গিয়েছে, দিন তো শেষ হয়ে এল। সেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন জনদাদু। তাকালেন গাছগুলোর নীচে। একটা গাছের নীচে রয়েছে কাঠের পাটাতন। তার তলায় খোঁড়া রয়েছে একটা সমাধির গর্ত। গোমেজ আগেভাগে তাঁর নিজের জন্য খুঁড়ে রেখেছেন গর্তটা। এই বয়সেও তিনি এত সুন্দর গর্ত খোঁড়েন যে, এ তল্লাটে এ কাজ তাঁর মতো কেউ করতে পারে না। মাস চারেক আগে তিনি এই গর্তটা খুঁড়ছিলেন। সেদিন জনদাদু তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার কাজটা যে আগেভাগেই সেরে রাখছ বড়ো!'

তাঁর কথা শুনে গোমেজ বলেছিলেন, 'যদি তুমি আগে যাও তাহলে তোমারটা নয় আমি খুঁড়ে দেব। কিন্তু আমি যদি আগে যাই তাহলে আমারটা কে খুঁড়বে শুনি? তাই আমার কাজটা নিজেই এখন সেরে রাখছি। তেমন হলে শুধু উপর থেকে মাটি ফেলে দেবে।'

এ-কথাটা মনে পড়ে গেল জনদাদুর। তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন পাটাতন

BanglaBook.org

ঢাকা সমাধিক্ষেত্রের সামনে। বর্ষার জলে ভেজা কাঠে উই ধরেছে। হাতের লাঠি দিয়ে জনদাদু উইয়ের বাসাগুলো ভাঙতে লাগলেন। হঠাৎ কেন জানি মনে হল, গোমেজের সঙ্গে হয়তো তাঁর আর দেখা হবে না। রাত হলেই ইদানীং তাঁর বুকের ব্যথাটা আবার বাড়ছে। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, ওষুধপত্তরে আর তেমন কাজ হবে না। রক্তমাংসের হলেও বুকের ভিতর যেটা দিনরাত ধুকপুক করে, সেটা তো আসলে একটা যন্ত্রই। বহু ব্যবহারে জীর্ণ। পুরোনো ঘড়ির মতো টিকটিক করে চলতে চলতে একদিন থেমে যাবে। একবার থেমে গেলে এ ঘড়ি আর সারানো যায় না।

উইয়ের বাসাটা ভাঙতে ভাঙতে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল জনদাদুর। সত্যিই কি আর দেখা হবে না বন্ধুর সঙ্গে? ছেলেবেলা, কৈশোর, যৌবনের

BanglaBook.org

কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে তাঁর সঙ্গে। সেই কোন ছেলেবেলায় গোয়া থেকে কীভাবে যেন এখানে এসে হাজির হয়েছিলেন গোমেজ। তারপর এখানেই তিনি জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। একদিনের জন্যও যিনি এ-গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও যাননি, তিনি কিনা তিন-তিনটে মাস ধরে নিখোঁজ! তিনি কি ভুলে গেলেন তাঁর সত্তর বছরের পুরোনো বন্ধু জনকে? উইয়ের বাসাটা ভাঙা হয়ে যেতে আরও কিছুক্ষণ বিষণ্ণ মনে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন জনদাদু। সূর্য ডুবে গিয়েছে, আকাশে ছড়িয়ে আছে তার লাল আভা। চারপাশে যে বড়ো বড়ো গাছ আছে, দিনের শেষে সেখানে নিজেদের বাসায় ফিরে আসছে পাখির দল। জনদাদু ফেরার জন্য এর পর হাঁটতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে যখন তিনি প্রায় গেটের কাছে এসে পড়েছেন, তখন তাঁর কানে এল টমের ডাক, 'দাদু, তুমি কোথায়? সন্ধ্যে হয়ে গেল, এবার ফিরে চলো।'

টম নিতে এসেছে তাঁকে। বছর চোদ্দো বয়সের টম, দাদুর একমাত্র নাতি। খুব ভালোবাসে সে দাদুকে। রোজ বিকেলে সে মাঠে খেলতে যাওয়ার সময় দাদুকে এখানে দিয়ে যায়। ঘণ্টা খানেক পর খেলা শেষে ফেরার পথে দাদুকে বাড়ি নিয়ে যায়। আজ অবশ্য সে স্কুল থেকে দেরি করে বাড়ি ফেরায়, দেরিতেই এখানে এসেছিলেন জনদাদু। টমের গলা শুনে জনদাদু বললেন, 'এই যে আমি এসে গিয়েছি।'

পাথরের স্তম্ভের উপর ছাদ-বসানো জীর্ণ ফটক দিয়ে বাইরে বের হওয়ার আগে আরও এক বার গোমেজের ছোট্ট ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকালেন জনদাদু। একটা বড়ো লোহার তালা ঝুলছে দরজায়। জল পড়ে মরচে ধরতে শুরু করেছে গায়ে। সেদিকে তাকিয়ে এক বার দু-পাশে মাথা নাড়লেন জনদাদু। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফটক পেরিয়ে সমাধিক্ষেত্রের বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখেই টম জিজ্ঞেস করল, 'কী, গোমেজদাদু ফিরলেন?'

জনদাদু বিষণ্ণ মনে বললেন, 'না।'

টম দাদুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলল, 'দেখো, আজ নাহয় কাল ঠিক ফিরে আসবেন।'

রোজই একথা বলে টম দাদুর মন ভালো করার চেষ্টা করে। কিন্তু

BanglaBook.org

গোমেজের ঘরের তালাটা বন্ধই থাকে। তার কথা শুনে জনদাদু বললেন, 'তাই হবে হয়তো!'

এরপর দাদু আর নাতি মিলে হাঁটা শুরু করলেন বাড়ি ফেরার জন্য। দাদুকে নিয়ে টমের বাড়ি ফিরতে আধঘণ্টা সময় লাগে। বর্ষাকাল, সমাধিক্ষেত্রের বাইরে বেরিয়ে একটু এগোবার পরই হঠাৎ কোথা থেকে যেন কালো মেঘ এসে আকাশ ঢেকে ফেলল। তার মিনিট দশেকের মধ্যেই বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। দাদু আর নাতি যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন তাঁরা একদম ভিজে চুপসে গিয়েছেন।

সেদিন রাতেই খুব জ্বর এল জনদাদুর। তার সঙ্গে বুকে ব্যথা। টমের ঠাকুরমা অনেক বছর আগেই মারা গিয়েছেন। সারারাত তাঁর শিয়রে জেগে বসে রইলেন টমের বাবা-মা। পরদিন সকাল বেলা ডাক্তারবাবুর এসে দাদুকে দেখে বললেন, তাঁর আর কিছু করার নেই।

বেলা বাড়ার সঙ্গেসঙ্গে জনদাদুর অবস্থা আরও খারাপ হতে শুরু করল। সংজ্ঞা হারালেন তিনি। দুপুরের দিকে মিনিট খানেকের জন্য একবার জ্ঞান ফিরে এল তাঁর। সেই সময় অস্ফুট স্বরে তিনি একবার বললেন, 'গোমেজ, কবে ফিরে এলে তুমি?' তার পরেই আবার তিনি চোখ বুজলেন। বিকেল হওয়ার আগেই সবাইকে কাঁদিয়ে এই গ্রাম, এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অজানার উদ্দেশে যাত্রা করলেন জনদাদু।

বিকেল বেলা টমদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল গ্রামেরই একদল ছেলে। তাদের কেউ টমের সমবয়সি, কেউ-বা টমের চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো। সমস্ত জোগাড়যন্ত্র করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে, তাই আর আজ জনদাদুকে সমাধি দেওয়া যাবে না। সে কাজ শেষ করতে হবে কাল সকাল বেলা। এই নিয়েই ছেলের দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল। তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ বলল, 'গোমেজদাদু তো নেই, সমাধিটা যখন আমাদেরই খুঁড়তে হবে, তখন কাজটা আজকেই সেরে রাখলে হয় না? সন্ধ্যে নামতে তো এখনও ঘণ্টা খানেক দেরি আছে।'

তার কথা শুনে অন্য ছেলেরা রাজি হল, 'হ্যাঁ, কাজটা এখনই সেরে রাখা উচিত!'

এর কিছুক্ষণের মধ্যে তারা বেরিয়ে পড়ল কোদাল গাঁইতি নিয়ে।

BanglaBook.org

বাড়িতে জনদাদুকে ঘিরে কান্নাকাটি চলছে। কেঁদে কেঁদে টমের চোখও ফুলে গিয়েছে। তার বাড়িতে থাকতে ভালো লাগছিল না। বাবা-মার অনুমতি নিয়ে টমও চলল ছেলেদের দলের সঙ্গে। কিন্তু তারা সমাধিক্ষেত্রে পৌঁছোবার আগেই গতদিনের মতোই হঠাৎই বর্ষার মেঘে ঢেকে গেল আকাশ। কেউ যেন কালি ঢেলে দিল আকাশের গায়ে।

তারা যখন সমাধিক্ষেত্রের সামনে পৌঁছোল তখনই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য সকলে দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল প্রবেশ-তোরণের ছাদের নীচে। জনা আটেক ছেলে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পরস্পরের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচার জন্য। বৃষ্টি কিন্তু ক্রমশই বাড়তে লাগল, তার সঙ্গে শুরু হল ঝড় আর আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝলকানি। গুম গুম শব্দে বাজ পড়তে লাগল। প্রচণ্ড বাতাসে ভিতরের বড়ো বড়ো গাছ পাগলের মতো মাথা নাড়তে লাগল। যেন চারপাশে শুরু হল মহাপ্রলয়। ছাদের তলায় দাঁড়িয়ে থাকলেও ছেলেরা পুরোপুরি বাঁচাতে পারল না নিজেদের। বাতাসে বৃষ্টির ছাঁট উড়ে এসে লাগতে শুরু করল তাদের গায়ে। তারা যে কাজ করার জন্য এখানে এসে হাজির হয়েছে, সে কাজ যে আর করা যাবে না, তা বুঝতে পারল সবাই। কিন্তু বৃষ্টি না থামলে আর বাড়ি ফেরার উপায় নেই। বিশেষত, যেভাবে বাজ পড়ছে তাতে তাদের আর কারও খোলা আকাশের নীচে যেতে সাহস হল না। সময় এগিয়ে চলল। বিকেল গড়িয়ে কখন যে সন্ধ্যে নামল তা কেউ বুঝতেই পারল না। ঠক ঠক করে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বৃষ্টি থামার প্রতীক্ষা করতে লাগল তারা। সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল, আর টম চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল দাদুর কথা। রোজ দাদুকে বিকেল বেলায় এখানে দিয়ে যেত, নিয়ে যেত টম। কাল বিকেল থেকে এ কাজ আর করতে হবে না।

ঘণ্টা তিনেক পর একসময় বৃষ্টি ধরে এল। যদিও মাঝে মাঝে কালো আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হয়তো একটু পরেই আবার বৃষ্টি নামবে। অন্ধকারের মধ্যে তো আর মাটি খোঁড়া সম্ভব নয়, কাজেই বৃষ্টি নামার আগে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। চারপাশে জল জমে গিয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে ছপ ছপ করতে করতে টম অন্যদের সঙ্গে পা বাড়াল সমাধিক্ষেত্রের বাইরে যাওয়ার জন্য।

BanglaBook.org

ঠিক সেই সময় সমাধিক্ষেত্রের ভিতর দিক থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল টমের কানে। শব্দটা কানে গিয়েছিল টমের পাশে হাঁটতে থাকা একটা ছেলেরও। দু-জনে থামকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ও কীসের শব্দ? দু-জনকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে অন্যরাও থেমে গেল। তাদের একজন টমকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল!'

টম বলল, 'কেমন একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি!'

তার কথা শুনে কান খাড়া করল সকলে। হ্যাঁ, একটা শব্দ ভেসে আসছে সমাধিক্ষেত্রের শেষ প্রান্ত থেকে! শব্দটা কীসের তা বোঝার চেষ্টা করতে লাগল সকলেই। এত রাতে অন্য কীসের শব্দ হতে পারে এখানে? দলের মধ্যে যে দু-এক জন একটু ভিতু গোছের ছেলে ছিল তারা হাত দিয়ে বুকে ক্রস আঁকল। এক জন হঠাৎ বলল, 'সমাধি-চোরের দল ঢোকেনি তো এখানে? গত মাসেই তো পাশের গ্রামের সমাধিক্ষেত্রের একটা গর্ত খুঁড়ে কারা যেন হাড়গোড় তুলে নিয়ে গিয়েছে বলে শুনেছি।'

এ খবরটা ছেলেদের মধ্যে আরও কয়েক জনের জানা। কাজেই সমাধি-চোরের কথাটা বাকিরা কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারল না। শব্দটা হয়েই চলেছে! এক জন বলল, 'তাহলে চল, দেখা যাক না ব্যাপারটা কী!'

অন্য এক জন বলল, 'কিন্তু যদি চোরের কাছে হাতিয়ার থাকে?'

আর-এক জন একথা শুনে বলল, 'আমাদের কাছেও তো গাঁইতি-কোদাল আছে, এত ভয়ের কী আছে?'

মিনিট দুয়েক আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নিল, এক বার দেখে নেওয়া যাক ব্যাপারটা। সন্তর্পণে কোদাল-গাঁইতি নিয়ে অন্ধকারে তারা এগোতে লাগল শব্দের দিকে। টমের বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অগত্যা সে-ও সকলের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে মাটি ভিজে গিয়েছে। পা বসে যাচ্ছে কাদামাটিতে। দু-পাশের ছোটোখাটো গাছ-ঝোপজঙ্গল নুয়ে পড়েছে পথের মধ্যে। চারপাশে জমাট অন্ধকার, শুধু মাঝে মাঝে যখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তখন তার আলোয় আবছা ফুটে উঠছে সমাধিক্ষেত্রের মাথার উপর জেগে থাকা সাদা পাথরের ক্রসগুলো।

জলকাদা আর ঘাসের জঙ্গল ভেঙে টমেরা এগোতে লাগল। কিছুক্ষণ পর তারা বুঝতে পারল, শব্দটা ভেসে আসছে সমাধিক্ষেত্রের শেষ প্রান্তে যে

BanglaBook.org

দেবদারু গাছ দুটো আছে, তার কাছ থেকে। ওই জায়গাতেই তো জনদাদুর সমাধির গর্ত খোঁড়ার কথা! আরও কয়েক পা সেদিকে এগোবার পর তারা এ-ও বুঝতে পারল, শব্দটা আসলে মাটির উপর কোদাল চালানোর শব্দ। ঝপ ঝপ শব্দে দ্রুত মাটি কেটে চলেছে কেউ। কে ওখানে! ধীরে ধীরে এগিয়ে, সকলেই গিয়ে দাঁড়াল একটা গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে। অন্ধকারের মধ্যে দেবদারু গাছের নীচে একটা অস্পষ্ট অবয়ব চোখে পড়ল টম আর তার সঙ্গীদের। যে দেবদারু গাছের নীচে জনদাদুর জন্য গর্ত কাটার কথা, সেখানেই মাটি খুঁড়ে চলেছে লোকটি। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সবাই ভাবতে লাগল, লোকটি কে? টমদের দিকে পিছন ফিরে মাটি কাটছে সে। হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল, একটা ছেলে ভালো করে দেখার জন্য একটু সরে দাঁড়াতে গিয়ে কাদামাটিতে পা পিছলে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল। আর তার সঙ্গেসঙ্গে থেমে গেল মাটি কাটার শব্দ।

টমের মনে হল, যেন ফিরে দাঁড়াল লোকটি। ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকার আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকাল। তার আলোয় মুহূর্তের জন্য সামনের অন্ধকার কেটে গেল। টমেরা দেখতে পেল, তাদের দিকে তাকিয়ে আছে কোদাল হাতে দীর্ঘদেহী একজন লোক। তার মাথার চুলগুলো শনের মতো সাদা। ঘাড় থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত নেমে আসা কালো কোটটা বৃষ্টিতে ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। একটা মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু তার মধ্যেই টম চিনে ফেলল তাঁকে। সে বলে উঠল, 'আরে, ইনি যে গোমেজদাদু!'

টমের কথা শেষ হতে-না-হতেই কাছেই কোথায় যেন প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। কেঁপে উঠল ছেলের দল। টম এবার চিৎকার করে বলল, 'গোমেজদাদু, কবে ফিরলেন আপনি?'

তার কথার কোনো উত্তর এল না, শুধু অন্ধকারের মধ্যে মাটির উপর কোদাল চালাবার শব্দ শুরু হল আবার। টম আবারও একই প্রশ্ন করল, কিন্তু এবারও সে কোনো উত্তর পেল না। কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সকলেই। আবার বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়তে শুরু করল। বৃষ্টি বাড়লে আর বাড়ি ফের যাবে না; তা ছাড়া গোমেজদাদু যখন ফিরে এসেছেন, তখন আর কোনো চিন্তা নেই। কাজেই সকলে এর পর বাড়ি ফেরার জন্য পা বাড়াল।

BanglaBook.org

বাড়ি ফিরে টম খবর দিল, 'গোমেজদাদু ফিরে এসেছেন।'

সেদিন মাঝরাতে ঘুম ভাঙতে একলা ঘরে খাটের উপর উঠে বসল টম। পাশের ঘরে তখন জনদাদুর মৃতদেহের কাছে বসে তন্দ্রায় ঢুলছেন অবসন্ন টমের বাবা-মা। বাইরে আকাশে তখন মেঘ কেটে গিয়েছে। খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের মেঝেয়। খাটে উঠে বসে জানলার বাইরে তাকাল টম। আর তখনই সে দেখতে পেল তাঁকে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে বাইরেটা। সেই আলোয় টমদের বাড়ির বাইরে কয়েক হাত দূরে ছোট্ট কাঠের বেড়ার ওপাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন গোমেজদাদু। তাঁর পরনে সেই লম্বা চুলের কোট, চাঁদের আলোয় তার মাথা-ভরতি সাদা চুল যেন আরও বেশি সাদা দেখাচ্ছে। তিনি চেয়ে আছেন টমদের বাড়ির দিকে। এত রাতে ওভাবে ওখানে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? ঘরের ভিতর থেকে তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল টম। গোমেজদাদু একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। মিনিট খানেকের মধ্যে টমের চোখের পাতা আবার বুজে এল। বিছানায় শুয়ে পড়ল টম।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ জনদাদুর কফিন নিয়ে শবযাত্রা রওনা হল সমাধিক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। ভোর বেলায় একজন লোককে সমাধিক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন টমের বাবা। সে ফিরে এসে খবর দিয়েছে যে, দেবদারু গাছের নীচে সুন্দরভাবে একটা গর্ত খুঁড়ে রাখা আছে। কিন্তু সে গোমেজদাদুকে সমাধিক্ষেত্রের ভিতর কোথাও দেখতে পায়নি। শবযাত্রা একসময় এসে পৌঁছোল সমাধিক্ষেত্রে। ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকতে টমের নজর পড়ল গোমেজদাদুর ঘরের দরজায় ভারী লোহার তালাটা সেখানে একইভাবে ঝুলছে। বর্ষার জলে মরচে ধরেছে তালায়।

কফিন নিয়ে সকলেই এসে হাজির হল দেবদারু গাছ দুটোর নীচে। সামনেই সুন্দরভাবে কেটে রাখা গর্ত। এ গর্ত গোমেজদাদুরই হাতের কাজ তাতে সন্দেহ নেই। এত নিখুঁত গর্ত তিনি ছাড়া আর কাটবেনই বা কে? কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়? কয়েক জন তাঁকে খুঁজতে শুরু করল সমাধিক্ষেত্রের চারপাশে। না, তাঁকে পাওয়া গেল না। বেশ কিছুক্ষণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করল সকালে। যদি তিনি শেষবারের জন্য দেখতে আসেন কফিনে শায়িত তাঁর বন্ধুকে। একসময় আকাশের কোনায় আবার মেঘ জমতে দেখা গেল।

BanglaBook.org

আর অপেক্ষা করা যাবে না, বৃষ্টি নামলেই সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। কাজেই জনদাদুকে শেষবারের মতো দেখে নিয়ে কফিনের মুখে ঢেকে দেওয়া হল। সকলের চোখের জলের সঙ্গে কফিন ধীরে ধীরে নেমে গেল মাটির গভীরে। এর পর ঝপাঝপ শব্দে মাটি পড়তে লাগল গর্তের ভিতর।

আকাশ ক্রমেই কালো হয়ে আসছে। শবযাত্রার সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের অধিকাংশই রওনা হয়ে গেল বাড়ি ফেরার জন্য। শুধু রয়ে গেল টম, আর যারা গর্তে মাটি ভরাট করছে, তারা।

তখন কাজ প্রায় শেষ। গর্ত ভরাট হয়ে গিয়েছে। সমাধির উপর মাটি লেপার কাজ করছে দু-তিন জন, আর অন্যরা ঘিরে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছে। হঠাৎ কীভাবে যেন এক জনের পা পড়ে গেল জনদাদুর সমাধির কয়েক হাত দূরে, কাঠের পাটাতন ঢাকা সেই সমাধির গর্তটার উপর। বৃষ্টিতে ভিজে পচে যাওয়া কাঠের পাটাতনে ছেলেটির পা পড়ার সঙ্গেসঙ্গেই সেটা মচ করে ভেঙে গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। ছেলেটিও পড়ে যাচ্ছিল গর্তের মধ্যে। পাশের এক জন শক্ত হাতে কোনো রকমে ধরে ফেলল তাকে। গর্তের মুখটা ফাঁক হয়ে গিয়েছে, বৃষ্টির জলে অর্ধেক ভরতি হয়ে আছে গর্তটা। তার মধ্যে তাকিয়ে হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল সকলের। গর্তের ভিতর জলের মধ্যে জেগে আছে একটা মাথার খুলি। জিনিসটা চোখে পড়া মাত্রই সকলে ভালো করে দেখার জন্য ঘিরে দাঁড়াল। দেখে বোঝা যাচ্ছে কফিনবাক্স ছাড়াই শরীরটাকে শোয়ানো হয়েছিল গর্তের মধ্যে। দাঁতের পাটিগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। টম একটা জিনিস লক্ষ করল, তার উপরের পাটির সামনের দুটো দাঁত সম্ভবত সোনা দিয়ে বাঁধানো। জলে ধুয়ে সেগুলো মৃদু চিকচিক করছে। কিন্তু এ গর্ত তো গোমেজদাদু নিজের জন্য খুঁড়ে রেখেছিলেন! এ মৃতদেহটা এখানে এল কী করে?

নিজেরা আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত মনে হল, ফাঁকা সমাধি দেখতে পেয়ে অন্য কোনো জায়গার লোকজন হয়তো সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছে। মৃত ব্যক্তির হয়তো তেমন কোনো লোকবল ছিল না। কাজেই যারা সমাধি দিতে এসেছিল তারা দায়সারাভাবেই কাজটা করে গিয়েছে। অথবা অন্য কোনো জরুরি কাজ ছিল তাদের, তাই কোনো রকমে মাটি দিয়েই সমাধির উপর কাটের পাটাতন আগের মতো চাপা দিয়ে গিয়েছে, যাতে

BanglaBook.org

বাইরে থেকে কেউ কিছু বুঝতে না পারে। কিন্তু এভাবে তো সমাধিটাকে খোলা ফেলে রাখা যায় না! জনদাদুর সমাধির উপর মাটি লেপার কাজ শেষ করে, সঙ্গো আনা পাথরের ক্রসটা সমাধির উপর পুঁতে দিয়ে সকলে মিলে তাই লেগে গেল জল-ভরতি সমাধিটাকে বোজাবার জন্য। আবার অন্ধকার হয়ে আসছে, বৃষ্টি নামল বলে। পাশ থেকে মাটি কেটে দ্রুত সমাধি বোজাতে লাগল সকলে। টম শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। গোমেজদাদু যখন ব্যাপারটা জানতে পারবেন তখন কত দুঃখ পাবেন তিনি। দুই দাদুর খুব সাধ ছিল পাশাপাশি ঘুমোবেন। সে সাধ আর পূর্ণ হল না। কোনো রকমে সমাধিটা বোজানো শেষ হওয়ার সঙ্গোসঙ্গোই বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। ক্লান্ত শরীরে ভিজতে ভিজতে সকলে পা বাড়াল বাড়ি ফেরার জন্য।

সেদিনের পর মাঝে আরও একটা দিন কেটে গেল। তার পরদিন বিকেল বেলা মা-র ধাক্কায় ঘুম ভেঙে বিছানার উপর উঠে বসল টম। মা বললেন, 'তাড়াতাড়ি উঠে পড়, দাদুর সমাধিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে আসতে হবে তো! সন্ধ্যে বেলার আগেই বাড়িতে লোকজন আসতে শুরু করবে কিন্তু!'

আজ সন্ধ্যে বেলা তাদের বাড়িতে জনদাদুর জন্য তিন দিনের প্রার্থনাসভা হবে। বেশ কিছু আত্মীয়-প্রতিবেশী আসবেন তাঁদের বাড়িতে। সামান্য কিছু আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করা হয়েছে তাঁদের জন্য। টম বাবার সঙ্গো সারা সকাল ব্যস্ত ছিল সেই কাজে। শেষ দুপুরে সে বিছানায় এসে শুয়ে ছিল। মা-র কথা শুনে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল টম। মুখ-হাত ধুয়ে, মা-র কাছ থেকে একটা বড়ো মোমবাতি নিয়ে বাড়ি ছেড়ে রওনা হল সমাধিক্ষেত্রের উদ্দেশে।

দু-তিন দিন টানা বৃষ্টির পর আজ সকাল থেকে আর বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টির পর গাছের পাতাগুলো বিকেলের আলোয় আরও সবুজ বলে মনে হচ্ছে। পথের পাশে ঝোপঝাড়গুলো থেকে বুনো ফুলের মিষ্টি এসে লাগছে টমের নাকে। এই পথ ধরেই রোজ বিকেলে টম দাদুকে পৌঁছে দিত সমাধিক্ষেত্রে। আজ সে চলেছে একা, দাদুর সমাধিতে বাতি জ্বালাতে। এই পথ দু-পাশের গাছপালা, বিকেলের আলো, পাখির ডাক, সবকিছুই একই রকম আছে। নেই শুধু জনদাদু।

BanglaBook.org

মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল টমের। তার কাছে কয়েকটা পয়সা ছিল। রাস্তার পাশে একটা দোকানে গিয়ে দেশলাই কিনল টম। দোকান ছেড়ে বেরিয়ে প্যান্টের পকেটে দেশলাইটা রাখতে গিয়ে পকেটের ভিতর কী একটা জিনিসে হাত ঠেকল টমের। কী এটা? টম পকেট থেকে বের করে আনল একটা খাম। খামটা দেখেই টমের মনে পড়ে গেল, আজ সকালেই পোস্টম্যান এসে দিয়ে গিয়েছিল সেটা। তখন টম কী একটা কাজে বাড়ির বাইরে যাচ্ছিল, খামটা সে পকেটে রেখে দিয়েছিল। তারপর আর খেয়াল ছিল না খামের কথা। হাঁটতে হাঁটতে খামটা আবার পকেটে ঢোকাতে গিয়েও হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ায় থেমে গেল টম। আরে, এ চিঠি যে জনদাদুর উদ্দেশে লেখা! কে লিখেছে চিঠিটা? তাঁর নামে তো কোনো চিঠি আসে না! টম কৌতূহলী হয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করল চিঠিটা। চিঠির তারিখটা মাস দুয়েক আগের। তাতে খুদে হস্তাক্ষরে লেখা—

প্রিয় জনখুড়ো,

আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় আপনি কুশলে আছেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমাদের গোমেজখুড়ো, আপনার প্রিয় বন্ধু আর আমাদের মধ্যে নেই। তিন দিন আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। এখানে আসার পর তিনি সুস্থই ছিলেন। কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি স্থানীয় এক দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়ে সোনা দিয়ে দুটো দাঁত বাঁধান। এর পরই তাঁর এখান থেকে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দাঁত বাঁধানোর পরই হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ডাক্তারের চেষ্টা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান তিনি। মৃত্যুশয্যায় বারবার বলছিলেন আপনার কথা। তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল, মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যেন আপনাদের গ্রামের সমাধিক্ষেত্রে সমাধি দেওয়া হয়। দূরত্ব ও আর্থিক অসুবিধের কারণে সে কাজ আমাদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এখানেও তাঁর মরদেহ আমরা সমাধি দিতে পারিনি। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এইরকম, তিন দিন আগে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি আর সেইসঙ্গে সমুদ্রে প্রবল জলোচ্ছ্বাস হয়। সমুদ্রের জল ঢুকে পড়ে সমাধিক্ষেত্রে। তার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা কফিন নামিয়ে রেখে

BanglaBook.org

সমাধিক্ষেত্রের এক কোনায় একটা ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিই। কিছুক্ষণ পর ঝড়বৃষ্টি একটু কমলে আমরা ফিরে গিয়ে দেখি, কফিনবাক্সটা কাত হয়ে পড়ে থাকলেও গোমেজখুড়োর শরীর আর তার মধ্যে নেই। চারপাশেও আর তাঁর সন্ধান পাইনি আমরা। আমার ধারণা, সমুদ্র অন্য কোথাও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে তাঁর শরীর।

গোমেজখুড়োর চলে যাওয়ার দুর্ভাগ্যজনক সংবাদ আপনাকে জানাতে হল বলে আমাকে মার্জনা করবেন। ঈশ্বরের কাছে আপনার নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ইতি

হতভাগ্য স্টিফেন গোমেজ

ওল্ড চার্চ রো, গোয়া।

চিঠিটা পড়ার পর কিছুক্ষণ রাস্তার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে রইল টম। তার মনে পড়ে গেল, জনদাদুর সমাধির পাশে গোমেজদাদুর জন্য খুঁড়ে রাখা গর্তের জলকাদার মধ্যে ভেসে থাকা সেই মুখটার কথা। কয়েক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল টম। তারপর সে আবার দোকানে ফিরে গেল। সে আর-একটা মোমবাতি কিনল সেখান থেকে। আর-একটু দড়িও চেয়ে নিল দোকানির কাছ থেকে। তারপর পা বাড়াল সমাধিক্ষেত্রের দিকে।

সমাধিক্ষেত্রে আর কোনো মানুষ নেই। শুধু মাঝে মাঝে ভেসে আসছে পাখির ডাক। টম প্রথমে গিয়ে হাজির হল দেবদাদু গাছ দুটোর কাছে। কিছু দূরে বুনো গোলাপের ঝাড় থেকে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। মোমবাতি-দেশলাই মাটিতে নামিয়ে রেখে একটু দূরের একটা গাছ থেকে শক্ত দুটো ছোটো ডাল ভেঙে আনল সে। ডাল দুটোকে আড়াআড়ি করে ক্রসের মতো বেঁধে সে পুঁতে দিল জনদাদুর পাশের সমাধির মাটির ঢিপির উপর। তারপর কিছু বুনো গোলাপ তুলে এনে তার পাপড়ি ছড়িয়ে দিল সমাধি দুটোর উপর। শেষে মোমবাতি দুটো জ্বালিয়ে একটা একটা করে বসিয়ে দিল সমাধি দুটোর সামনে। কাজ মিটে যাওয়ার পর সমাধি দুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে টম কয়েক মুহূর্ত শ্রদ্ধা জানাল মাটির গভীরে শুয়ে থাকা মানুষ দুটোর প্রতি। তারপর পা বাড়াল ফিরে যাওয়ার জন্য।

ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে টম এসে হাজির হল সমাধিক্ষেত্রের বাইরে যাওয়ার তোরণের সামনে। বাইরে পা রাখার আগে সে শেষবারের জন্য একবার ফিরে তাকাল দূরের দেবদারুগাছ দুটোর দিকে। বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে গাছ দুটো। তাদের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে আসা শেষ বিকেলের আলোয় গাছ দুটোর নীচে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছেন দু-জন বৃদ্ধ মানুষ। তাঁরা যেন হাসছেন টমের দিকে তাকিয়ে। টম তাঁদের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানাল, তারপর খুশি মনে হাঁটতে শুরু করল বাড়ির পথে।

BanglaBook.org

শ্রাঙ্কেন হেড

জিপটা তাপসকে নামিয়ে দিয়ে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কী প্রচণ্ড ঠান্ডা! চামড়ার জ্যাকেট আর উলের কানঢাকা টুপি ভেদ করে শীত যেন কামড়ে ধরতে চাইছে তাকে। আর এত ঠান্ডা হবে নাই-বা কেন? আজ জানুয়ারির পাঁচ, তার ওপর আবার জায়গাটা দার্জিলিং! জিপের আলোটা পথের বাঁকে মিলিয়ে যেতেই চারপাশে একবার ভালো করে তাকাল তাপস। কেউ কোথাও নেই। টুরিস্ট সিজন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এ সময় এখানকার হোটেল-কনভেন্টগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। ঠান্ডায় অর্ধেক লোক নীচে চলে যায়। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড একদম খাঁখাঁ করছে। তার লাগোয়া ভুটিয়া জিনিসপত্তরের দোকানগুলোর ঝাঁপও বন্ধ। একটা কুকুর পর্যন্ত নেই! তাপসের রিস্টওয়াচে সাতটা বাজে। পঙ্খাবাড়িতে জিপটা খারাপ হয়ে গেছিল বলে তাপসের এখানে পৌঁছোতে ঘণ্টা খানেক দেরি হয়েছে ঠিকই, তা বলে শীতের দার্জিলিং সন্ধ্যা নামতেই যে এত শুনসান হয়ে যায় তা ধারণা ছিল না তার।

চারপাশ একবার দেখে নেবার পর তাপস তাকাল ওপর দিকে। বেশ কিছুটা ওপরে একটা রেলিং ঘেরা জায়গাতে কুয়াশা মেখে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ল্যাম্পপোস্ট। হলদেটে বাতি জ্বলছে। তাপস চিনতে পারল, ওটা 'ম্যাল'। আগেও বার তিনেক দার্জিলিং-এ এসেছে তাপস। কখনো বন্ধুবান্ধব, কখনো-বা পরিবার পরিজনের সাথে নিছক বেড়াবার জন্য, গরমকালে। আর এবার সে এসেছে একটা কাজ নিয়ে। আসলে তাপস একটা বড়ো ক্যুরিয়র কোম্পানিতে মোটামুটি চাকরি করে। অফিসেই তার কাজ। কিন্তু সম্প্রতি কোম্পানির সাথে একটা গণ্ডগোলের জেরে স্ট্রাইক করেছে ক্যুরিয়ার ম্যানরা। এর ফলে সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। এদিকে বেশ কিছু চিঠি আর মালপত্র ডেসপ্যাচের অপেক্ষায় কোম্পানির ঘরে জমা

BanglaBook.org

আছে। তার মধ্যে বেশ কিছু জিনিস আবার ইনসিওর্ড করা। সেগুলো ঠিক সময় প্রাপকের হাতে পৌঁছে দিতে না পারলে কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি তো হবেই, তার সাথে সুনামেরও ক্ষতি হবে। বিশেষত এই দ্বিতীয় ক্ষতিটা এড়াতেই কোম্পানির মুম্বাইয়ের হেড অফিস থেকে তাপসদের কলকাতার অফিসে নির্দেশ এসেছে যে, বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো আর স্ট্রাইক ওঠার অপেক্ষায় ফেলে রাখা যাবে না। অফিস স্টাফদের দিয়ে ডেলিভারি করাতে হবে। ওরকমই একটা ইনসিওর করা পার্সেল জায়গা মতো পৌঁছে দেবার জন্যই ওপরঅলার নির্দেশে এই প্রবল শীতে কলকাতা থেকে দার্জিলিং-এ এসে পৌঁছেছে তাপস। পার্সেলটা অবশ্য খুব বড়ো নয়, দেড় ফুট বাই দেড় ফুট একটা হালকা কাঠের বাক্স। তাপসের ব্যাগের মধ্যেই রয়েছে সেটা। তাপস একবার ভাবল, ব্যাগ থেকে পার্সেলটা বার করে তার গায়ে লেখা ঠিকানাটা দেখে নেবে। এর পরক্ষণেই তার মনে হল, কাছেপিঠে তো কোনো লোক নেই, কাকে সে জিজ্ঞেস করবে ঠিকানাটা। তার চেয়ে ওপরে উঠে কাজটা করাই ভালো। ম্যালে তো ঠিকানা জানার মতো কোনো লোক পাওয়া যাবেই। এই ভেবে, ব্যাগটা কাঁধে ফেলে জিপ স্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে পাথরের ধাপ ভেঙে ম্যালের দিকে উঠতে শুরু করল তাপস।

মিনিট দশেকের মধ্যেই সে ম্যালে উঠে এল। কিন্তু এ জায়গাটাও কেমন যেন শুনসান। বড়ো বড়ো দোকানপাটগুলো সব বন্ধ। দু-একটা হোটেলের কাঁচের জানলার ভিতর থেকে ক্ষীণ আলো ভেসে আসছে। হোটেলগুলোর সামনে বা ম্যালে কোনো লোকজন নেই, শুধু এক জন বুড়ো ঘোড়াঅলা রেলিং-এর একপাশে দাঁড়িয়ে তার ঘোড়ার পিঠে কী যেন মালপত্র তুলছে। তাপস একটা ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে পার্সেলটা বার করল। সেটা যে অনেক দূর থেকে এসেছে তা আগেই দেখেছে তাপস। কার্গো শিপের স্টিকার লাগানো আছে কাঠের ওপর হলদেটে মোটা কাপড় জড়ানো বাক্সটার গায়ে। কলম্বিয়া থেকে অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে পার্সেলটা এসেছে এদেশে। সেটা অবশ্য কোনো আশ্চর্য বিষয় নয়, পৃথিবী এখন অনেক ছোটো হয়ে গেছে। তাপসের পাড়ার একটা ছেলেই তো চাকরি সূত্রে ব্রাজিলে আছে। সেও মাঝে মাঝে সে দেশ থেকে এটা-ওটা পাঠায় তার কলকাতার বাড়িতে। কলম্বিয়া থেকে দার্জিলিং-এ পার্সেল তো আসতেই পারে।

BanglaBook.org

ল্যাম্পপোস্টের ফ্যাকাসে আলোয় পার্সেলের গায়ে লেখাগুলো আর-একবার ভালো করে দেখল তাপস। প্রেরক এবং প্রাপকের নাম দুই-ই সেখানে লেখা আছে—প্রেরক, এম. এম. সান্যাল, বোগোটা, কলম্বিয়া। বোগোটা যে কলম্বিয়ার রাজধানী, তা জানা আছে তাপসের। প্রাপকেরও নাম এম. এম. সান্যাল। ঠিকানা, ব্ল্যাক লগ হাউস, নিয়ার ম্যাল রোড, দার্জিলিং। প্রেরক এবং প্রাপকের নামের আদ্যক্ষর এবং পদবি যখন হুবহু এক, তখন তারা পরস্পরের নিকটাত্মীয়ই হবে। মনে মনে ভাবল তাপস। ঘোড়াওয়ালার কাছে এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইল, 'ম্যাল রোডের কাছে ব্ল্যাক লগ হাউস কোথায়?'

ঘোড়াওয়ালা তাপসের প্রশ্ন বুঝতে পারল কি না কে জানে, সে জবাব দিল, 'মালুম নেহি সাব। আপ উস দুকান মে পুছিয়ে।'—এই বলে সে আঙুল তুলে একটু দূরে একটা দোকান দেখিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল।

ম্যালের দক্ষিণ দিকে একটা গলির মুখে সেই দোকানের ঝাপ প্রায় বন্ধ। তবে ভিতরে লোক আছে। একটা ক্ষীণ আলো ভেসে আসছে দোকানের ভিতর থেকে। ঘোড়াওয়ালার সাথে আর বাক্য ব্যায় না করে তাপস পা বাড়াল সেই দোকানের দিকে। যা ঠান্ডা পড়েছে তাতে দ্রুত কাজ সেরে কোনো হোটেলের কম্বলের তলায় ঢুকতে হবে তাকে। ঠিকানাটা যদি কাছাকাছির মধ্যে হয়, তাহলে তেমন কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু যদি দূরে হয়, তবে এখন সে কোনো হোটেলে ঢুকে পড়বে। কাল ভোরে পার্সেলটা জায়গা মতো পৌঁছে দিয়ে তারপর ফেরার জন্য গাড়ি ধরবে। এই ঠান্ডার মধ্যে তার পক্ষে বেশি ঘোরাঘুরি করা সম্ভব নয়। এ কথা ভাবতে ভাবতে তাপস গিয়ে উপস্থিত হল দোকানের সামনে।

কাঠের ঝাপ ঠেলে দোকানের ভিতর প্রবেশ করতেই তাপস বুঝতে পারল, সেটা একটা কিউরিও শপ। দোকানের ভিতর উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। কাচের শোকেসে, দেওয়ালের গায়ে রাখা আছে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিক মূর্তি, থাংকা, তিব্বতি মুখোশ, নেপালি কুকরি ইত্যাদি। কাউন্টারে বসে ছিলেন, গলা বন্ধ কোট, কুকরির এমব্লম লাগানো টুপি পরা একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। চোখে চশমা। তাপস কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়েস?'

BanglaBook.org

তাপস পার্সেলটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি এই ঠিকানাটা খুঁজছি।'

ঘসা কাঁচের ফাঁক দিয়ে ভদ্রলোক পার্সেলের গায়ের লেখাগুলো ভালো করে একবার পড়লেন। তারপর ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এখানে কোনো বাড়ির নাম, ব্ল্যাক লগ হাউস আছে বলে তো আমার জানা নেই। তবে কাঠের বাড়ি তো এখানে অনেকেরই আছে।'

তাপস একটু হতাশ হল তার কথা শুনে। ভদ্রলোক এরপর বললেন, 'এ তো দেখছি চল্লিশ বছর আগের পার্সেল!'

তাপস বলল, 'না, না, অত পুরোনো নয়, মুম্বাই থেকে কিছু দিন হল এখানে এসেছে।'

তার কথা শুনে সেই ভদ্রলোক কোনো কথা না বলে পার্সেলের নীচের দিকের একটা অংশ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। বাক্সর ওপর জড়ানো হলদেটে কাপড়টা সম্ভবত ঘষা লেগে ছিড়ে গেছে সেখানে। হলদে কাপড়ের

BanglaBook.org

ভিতর একটা বিবর্ণ কাপড়ের আস্তরণ চোখে পড়ছে। সেখানে প্রায় অস্পষ্ট ভাবে লেখা, ভিক্টোরিয়া কার্গো, নাইন্টিন সিক্সটি, বোগোটা। ওই লেখাটা তাপসের চোখে পড়েনি। নাইন্টিন সিক্সটি মানে তাপসের জন্মেরও কুড়ি বছর আগে। এরকম মাঝে মাঝে হয় বলে শুনেছে যে। বিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে গুদামে পড়ে থাকা দাবিহীন পার্সেলের দাবিদারের সন্ধান মেলে। তখন আবার সেটা সেই দাবিদারের নতুন ঠিকানায় পাঠাতে হয়। একে বলে 'রি-পার্সেলিং'।

'এটাও তাহলে সে রকমই একটা পার্সেল,' মনে মনে ভাবল তাপস। সে লেখাটা দেখার পর বৃদ্ধকে বলল, 'দারুণ চোখ তো আপনার।'

তিনি উত্তর দিলেন, 'কিউরিওর ব্যাবসা করি তো, তাই।'

কিন্তু যে ঠিকানার খোঁজে তাপসের দোকানে ঢোকা বৃদ্ধ তা বলতে না পারায় সে পার্সেলটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত। আমি যাচ্ছি।'

এই বলে সে দোকানের বাইরে পা বাড়াতে যেতেই বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন, 'একটু দাঁড়ান।' দাঁড়িয়ে পড়ল তাপস।

ভদ্রলোক একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'এখানে একটা অনেক পুরোনো কালো রঙের কাঠের বাড়ি আছে। তবে এখন সেখানে কেউ থাকে বলে আমার জানা নেই। বছর পঞ্চাশ আগে, আমি যখন নতুন দোকান খুলি তখন এক বাঙালি ভদ্রলোক ওই বাড়িতে থাকতেন। আমার দোকানে একই নামে তিব্বতি মুখোশ কিনতে আসতেন। তারপর দার্জিলিং ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছিলেন তিনি। আপনি ওই বাড়িটাতে একবার গিয়ে দেখতে পারেন।'

তাপস শুনে বলল, 'ব্ল্যাক লগ হাউস যখন ঠিকানা, তখন সে বাড়িটা হলেও হতে পারে। তা বাড়িটা কোথায়?'

তিনি বললেন, 'আপনি স্টেপ এসাইড চেনেন?'

তাপস বলল, 'হ্যাঁ।'

তিনি বললেন, 'স্টেপ এসাইড, ভুটিয়া বস্তি পার হয়ে একটু এগোলে দেখবেন, ডান হাতে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটা রাস্তা নীচের দিকে নেমে গেছে। ওই রাস্তার শেষ প্রান্তে বাড়িটা। রাস্তাটা একটু নির্জন ঠিকই। কিন্তু চোর-ডাকাতের ভয় নেই।'

BanglaBook.org

কিউরিও শপের মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে তাপস বাইরে এসে দাঁড়াল। কেউ কোথাও নেই। সেই ঘোড়াওয়ালাও চলে গেছে। আরও শূন্যতা যেন নেমে এসেছে চারপাশে। লাইট পোস্টের ক্ষয়াটে আলোর নীচে কুয়াশার মধ্যে পড়ে রয়েছে সবুজরঙা বসার জায়গাগুলো। অথচ গ্রীষ্মকালে এখানে এ সময় থিকথিক করে টুরিস্ট। দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে তাপস একবার ভাবল, পরদিন সকালেই সে বাড়িটার খোঁজে যাবে। তার পরক্ষণেই আবার তার মনে হল, তাহলে সারা রাত তাকে একটা চিন্তা নিয়ে কাটাতে হবে। স্টেপ এসাইড জায়গাটা তার চেনা, বেশি দূরে নয়, একবার দেখেই আসা যাক না বাড়িটা। আর পার্সেলটা যদি ওই ঠিকানারই হয়ে থাকে, তাহলে সে সেটা সেখানে গছিয়ে দিয়ে হোটেলে ফিরে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে। মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে। এক ঘণ্টার মধ্যেই সে নিশ্চয়ই ফিরে আসতে পারবে সে। এই ভেবে তাপস হাঁটতে শুরু করল।

ম্যাল ছেড়ে তাপস স্টেপ এসাইডের রাস্তা ধরল। চেনা রাস্তা। এর আগে বেড়াতে এসে প্রতিবারই দেশবন্ধুর বাস ভবন স্টেপ এসাইড দেখতে গেছে। সত্যিই খুব ঠান্ডা লাগছে তার। মাফলরটা টুপির ওপর ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে তাপস হাঁটতে লাগল। রাস্তার পাশে বাড়িগুলো সব নিঝুম। শীতের মধ্যে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে।

একসময় সে পৌঁছে গেল স্টেপ এসাইড। সেখানেও কোনো লোকজন চোখে পড়ল না তার। স্টেপ এসাইড, ঘুমন্ত ভুটিয়া বস্তি পিছনে ফেলে আর একটু এগোতেই ডান দিকেই ঢাল বেয়ে একটা রাস্তা নেমে গেছে দেখতে পেল তাপস। রাস্তা মানে পাথরের ধাপ। সেই ধাপ বেয়ে নীচে নামতে শুরু করল সে। ঠিক তখনই আকাশ থেকে পেঁজা তুলোর মতো কী যেন ঝরে পড়তে শুরু করল তাপসের গায়ে। তুষারপাত শুরু হয়েছে। বেশ অনেকটা নীচে নামার পর তাপস একটা সমতল জায়গাতে এসে দাঁড়াল। রাস্তা চলে গেছে সামনের দিকে। তার দু-পাশে ইউক্যালিপ্টাসের ঘন বন।

তাপস আবার হাঁটতে শুরু করল। চারদিকে কোনো আলো নেই। আস্তে আস্তে সাদা বরফের চাদরে ঢেকে যাচ্ছে গাছের মাথাগুলো। হিমেল বাতাসের ফিসফাস শব্দ শোনা যাচ্ছে ইউক্যালিপ্টাসের বন থেকে। এত

BanglaBook.org

নির্জন যে এবার তাপসের ভয় ভয় করতে লাগল। তার মনে হল, এত রাতে তার এ জায়গাতে আসা ঠিক হয়নি। বনের মধ্যে দিয়ে আরও কিছুটা এগোবার পর তাপস যখন ভাবছে এবার ফিরে যাওয়াই ভালো, ঠিক সেই সময় তার চোখে পড়ল সেই বাড়িটা। ক্ষীণ চাঁদের আলোতে প্রায় অন্ধকারের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে আছে কাঠের বাড়িটা। তুষারপাতের ফলে তার ঢালু ছাদটা শুধু একটু সাদাটে দেখাচ্ছে। বাড়িটা দেখতে পাওয়ার সাথে সাথেই তাপসের মনের মধ্যে ভয়টা উবে গিয়ে একটা উৎসাহের সৃষ্টি হল। যাক বাড়িটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল!

তাপস পৌঁছে গেল বাড়িটার সামনে। একটা অনুচ্চ পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাড়িটা। তিন দিকে ইউক্যালিপ্টাসের ঘন বন। কম্পাউন্ডের ভিতর প্রবেশ করে সোজা রাস্তা ধরে তাপস গিয়ে দাঁড়াল বাড়ির সদর দরজার সামনে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোতে তাপস দেখল দরজার পাশে একটা ফলকে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কয়েকটা হরফ—'এম. এম. সান্যাল।' লেখাটা দেখেই মনটা নেচে উঠল তার। যাক এই প্রবল ঠান্ডার মধ্যে এতটা পথ আসা বিফলে যায়নি তার। ভাগ্যিস সেই বৃদ্ধ এই বাড়িটার কথা বলেছিল।

বাড়ির ভিতর কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না। জানলার কাচের শার্সিগুলো পিছনে বিরাজ করছে জমাট বাঁধা অন্ধকার। কোনো শব্দও নেই বাড়ির ভিতর। অথচ সদর দরজা ভিতর থেকেই বন্ধ। অর্থাৎ লোক আছে বাড়িতে। তাপস প্রথমে দু-বার হালকা টোকা দিল দরজাতে। না, কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। এর পর আবার টোকা মারল সে, একটু জোরে। এবারও কোনো সাড়া মিলল না। তৃতীয় বার বেশ জোরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাপস একটু গলা তুলে বলল, 'এই যে শুনছেন, বাড়িতে কেউ আছেন?' তার গলার শব্দে আর দরজা ধাক্কানোর শব্দে কাছের ইউক্যালিপ্টাস গাছ থেকে কী একটা পাখি ডানা মেলে উড়ে গেল বিষণ্ণ চাঁদের দিকে। কয়েক মুহূর্ত একদম নিস্তব্ধ। তার পর তাপস যখন আবার দরজায় ধাক্কা দিতে যাচ্ছে ঠিক তখনই তার মনে হল একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন ঘষটে ঘষটে এগিয়ে আসছে বন্ধ দরজার ওপাশে। কান খাড়া করল তাপস। হ্যাঁ, একটা শব্দ! ঠিক দরজার ওদিকে এসে শব্দটা থেমে গেল। আবার কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তার পরেই একটা শব্দ তুলে খুলে গেল ভারী কাঠের দরজা। তাপস দেখল

BanglaBook.org

দরজার কয়েক হাত তফাতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু তার অবয়বটুকুই বোঝা যাচ্ছে। তাপস তাকে দেখে বলল, 'মিস্টার সান্যাল আছেন? আমি একটা ক্যুরিয়ার কোম্পানি থেকে আসছি। তাঁর নাম পার্সেল আছে।' তার কথা শুনে কোনো উত্তর দিল না সেই ছায়ামূর্তি। তাপসের মনে হল সে যেন তার ঘাড়টা একটু নাড়াল।

তাপস এরপর বলল, 'তাঁকে একটু ডেকে দেবেন। পার্সেলটা নিতে হলে সইসাবুদের একটা ব্যাপার আছে।' লোকটা এবারও মুখে কিছু বলল না, শুধু ইশারায় তাপসকে দাঁড়াতে বলে এগিয়ে এসে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল।

তাপস দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। মনে মনে সে ভাবল, 'লোকটা কেমনরে বাবা! কোনো কথা বলল না, তারপর দরজার পাল্লাটা তার মুখের ওপর এভাবে দিয়ে দিল!' বাইরে তুষারপাত আরও বাড়ছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঠান্ডা বাতাস। ঠান্ডাতে জমে যাচ্ছে তাপস। মিনিট চার দাঁড়িয়ে থাকার পর বাড়ির ভিতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ভিতরে আসুন।' দরজার পাল্লা ঠেলে বাড়ির ভিতর পা রাখল তাপস। প্রথমে একটা অন্ধকার ঘর। সেই ঘরের ওপাশে অন্য একটা ঘর থেকে মৃদু আলোক রেখা ভেসে আসছে। তাপস এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সেই ঘরের দরজায়। দরজার সোজাসুজি একটা টেবিল রাখা আছে ঘরের মাঝখানে। সেই টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি জ্বলছে। টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ারে বসে আছেন ড্রেসিং গাউন পড়া পক্ককেশ এক ভদ্রলোক। তাপস দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি ইশারাতে ঘরের মধ্যে ঢুকতে বললেন তাকে।

কাঠের ওপর দামি কার্পেট বিছানো ঘরের মেঝেতে পা রাখল তাপস। ভিতরে ঢুকেই সে অবাক হয়ে গেল। ঘরের চারদিকে দেওয়ালে টাঙানো আছে বিচিত্র সব মুখোশ। ঘরটা ঠিক যেন একটা মিউজিয়াম! ধীর পায়ে তাপস টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক ঠিক তাঁর মুখোমুখি একটা গদি আঁটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন। বাইরে ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে থাকতে নিশ্চয়ই বেশ কষ্ট হল আপনার।' ভদ্রলোকের বেশ ভরাট গলা। তার বাচনভঙ্গিতেও বেশ একটা আভিজাত্য আছে।

BanglaBook.org

মৃদু হেসে তাপস চেয়ারটাতে বসল। তারপর পার্সেলটা টেবিলে রেখে ভদ্রলোকের উদ্দেশে বলল, 'আমি তাপস বসু। কলকাতা থেকে আসছি। আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার এম. এম. সান্যাল। আপনার জন্য এই পার্সেলটা আছে। কলম্বিয়া থেকে এসেছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ আমিই সেই লোক।' এই বলে তিনি এক বার তাকালেন টেবিলের ওপরে রাখা পার্সেলের দিকে। তাপস লক্ষ করল সে

দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর মুখবয়বে কোনো পরিবর্তন হল না। পার্সেলটা যে আসবে তা যেন জানাই ছিল তার।

পকেট থেকে চালানের কাগজ বার করে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে তাপস বলল, 'পার্সেলের নম্বরের সাথে নম্বর মিলিয়ে চালানটাতে একটা সই করতে হবে।'

কাগজটা হাতে নিয়ে বাক্সটা কাছে টেনে নম্বরটা মেলালেন ভদ্রলোক। তারপর কলমদানি থেকে একটা কলম তুলে কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে সই করতে লাগলেন। সেই সুযোগে তাপস একবার ভালো করে দেখল ভদ্রলোককে। তার বয়স সত্তরের বেশিই হবে। এই বয়সেও বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ের রং একসময় বেশ ফর্সাই ছিল মনে হয়, এখন তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে। প্রশস্ত ললাট। টিকালো নাক, নিখুঁতভাবে কামানো মুখমণ্ডল। তবে, তার চোখের দৃষ্টি কেমন যেন বিষণ্ণ! যেসব বয়স্ক মানুষ নিঃসঙ্গতায় ভোগেন, তাদের চোখের দৃষ্টি যেমন হয় ঠিক সেরকম। ঘরটার দিকেও একঝলক তাকাল তাপস। রুচি আর আভিজাত্যের ছাপ ছড়িয়ে আছে ঘরে। দেওয়ালে নানারকম মুখোশ তো আছেই, পায়ের তলায় দামি কার্পেট, একপাশে ওক কাঠের বেশ কয়েকটা বড়ো আলমারি-ভরতি বই, সাবেক আমলের সোফাসেট, টেবিলের ওপর মোমদানিটাও মনে হয় রুপোর তৈরি। ফায়ারপ্লেসটিতে কাঠকয়লার আঁচ জ্বলছে। কারুকাজ করা ফায়ারপ্লেসের মাথার ওপর বসানো আছে বেশ বড়ো পিতলের মূর্তি। মনে হয় অ্যান্টিক হবে।

সই করে কাগজটা তাপসের হাতে দিলেন ভদ্রলোক। গোটা হরফে পুরো নাম সই করেছেন—'মৃগাঙ্ক মোহন সান্যাল'। পুরো নামটা দেখে তাপসের হঠাৎ কেন জানি মনে হল, এ নাম যেন আগে কোথাও শুনেছে বা পড়েছে। যাই হোক, সইটা ঠিক মতো হয়েছে কি না তা দেখে নিয়ে কাগজটা ভাজ করে পকেটে রাখল তাপস। তার কাজ হয়ে গেছে। এবার উঠতে হবে তাকে। তাই তাপস ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে বলল, 'ধন্যবাদ। আমি তাহলে এখন উঠি?'

ভদ্রলোক তাকিয়ে ছিলেন কাচের শার্সিওয়ালা জানলার দিকে। তাপসের কথা শুনে বললেন, 'কিন্তু আপনি এখন যাবেন কী করে? বাইরে

BanglaBook.org

তো তুষারপাত আর ঝড় শুরু হয়েছে। আপনি বরং একটু বসে যান।' তাপস তাকাল জানলার দিকে। বাইরের শব্দ ঘরের মধ্যে না ঢুকলেও তাপস দেখল বাতাসের প্রবল ধাক্কায় জানলার কাচের শার্সিগুলো থরথর কাঁপছে। মৃগাঙ্ক মোহনের কথা শুনে সে উঠতে গিয়েও থমকে গেল। সত্যিই তো এ অবস্থায় বাইরে সে কী করে বেরোবে! কিন্তু তুষারপাত আর ঝড় যদি না থামে তবে? এ কথা ভেবে মনে মনে একটু ভয় পেয়ে গেল তাপস।

মৃগাঙ্ক মোহন মনে হয় তার মনের ভাব বুঝতে পারলেন। তাই তিনি বললেন, 'এই ঝড় বেশিক্ষণ হয় না। সম্ভবত কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে যাবে।'

তাপস বলল, 'তা হলেই ভালো। আসলে, পাহাড়ি পরিবেশে আমরা ঠিক অভ্যস্ত নইতো। তুষারপাত আমি এই প্রথম দেখলাম।'

মৃগাঙ্গ মোহন মৃদু হাসলেন। তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন, 'জানেন, অনেক অনেক দিন আগে এরকমই এক রাতে জনমানব শূন্য উরাল পর্বতের ঢালে, সারা রাত তুষারপাতের মধ্যে একলা কাটিয়ে ছিলাম আমি। তিন ফুট তুষারের চাদরের নীচে ঢেকে গেছিল আমার দেহ। বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। নেহাত ভাগ্যের জোরে পর দিন দুপুরে স্থানীয় ঘোড়াওয়ালারা আমাকে বরফের নীচ থেকে উদ্ধার করে।'

আপনি কি মাউন্টেনিয়ার ছিলেন?' তাপস প্রশ্ন করল।

ভদ্রলোক বলল, 'না, অনেক পাহাড়ে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি ঠিকই, কিন্তু মাউন্টেনিয়ার বলতে যা বোঝায় তা আমি ছিলাম না।' একটু চুপ করে থাকার পর মৃগাঙ্ক মোহন বললেন, 'আসলে আমি ছিলাম একজন ভূ-পর্যটক অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে গ্লোব ট্রটার।

মৃগাঙ্ক মোহনের কথা এবার হঠাৎই যেন তাপসের স্মৃতির তন্ত্রীতে ঘা দিল। কেন 'মৃগাঙ্ক মোহন' নামটা তার চেনা মনে হচ্ছিল তা বুঝতে পারল সে। কয়েক মুহূর্ত আশা-নিরাশার দোলা চালে থাকার পর তাপস তাঁকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আপনি কি পর্যটকের ডায়েরি বলে একটা বই লিখেছিলেন?'

একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল মৃগাঙ্ক মোহনের ঠোঁটের কোণে। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ওটা আমার লেখা।'

চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল তাপস কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'ওটা তো একটা বিখ্যাত বই! আমি ছোটোবেলা থেকে আজ

BanglaBook.org

পর্যন্ত অনেক বার পড়েছি আপনার ওই ভ্রমণ কাহিনি। আমি ভাবতেই পারছি না আপনার মতো বিখ্যাত লোকের সামনে আমি বসে আছি!'

মৃগাঙ্ক মোহনের চোখ দুটো এবার যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'আপনি পড়েছেন বইটা! আমি কিন্তু নিজে বই আকারে লেখাটা চোখে দেখিনি! ভুলেই গেছিলাম ওই লেখার কথা। এত বছর পর আবার আপনার মুখে সে বইয়ের কথা শুনলাম!'

তাপস একটু অবাক হয়ে বলল, 'আপনার লেখা বই আপনি দেখেননি কেন?'

তিনি জবাব দিলেন, 'আমি বিদেশ থেকে ডাকে পাঠিয়েছিলাম লেখাগুলো। প্রকাশক ছেপে ছিলেন। আমি বইটা হাতে পাইনি। আমার কোনো স্থায়ী ঠিকানা ছিল না, যেখানে তিনি বইটা পাঠাতে পারতেন। তা বইটা আপনার ভালো লেগেছিল?' এই বলে তাপসের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

তাপস বলে উঠল, 'শুধু আমার কেন, যারা বইটা পড়েছেন প্রত্যেকেরই অসাধারণ ভালো লেগেছে আপনার লেখা। কী সুন্দর আপনার লেখনশৈলী! কী সুন্দর বিবরণ! সবাই তো বলেন, ভ্রমণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনার বই একটা ল্যান্ডমার্ক!' এরপর একটু বিমর্ষ হয়ে সে বলল, 'তবে আমি কিন্তু আপনার বইয়ের প্রথম খণ্ডটাই পড়েছি। মানে ওই আমেরিকা ভ্রমণ পর্যন্ত। অন্য খণ্ডগুলো আর পড়া হয়নি।'

তাপসের কথা শুনে মৃগাঙ্ক মোহন চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে কেটে গেল। তাপস একবার তাকাল জানালার দিকে। একটা ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। ঝড়ের সাথে সাথে বরফের কুচিও এসে আঘাত করছে জানলার কাচে। এরপর তাপস আবার তাঁকে প্রশ্ন করল, 'আপনার লেখাটা কিন্তু আমার মনে আছে। আচ্ছা, আপনার লেখার মধ্যে যে আরবে মরুঝড়ের মুখোমুখি হওয়া বা নীলনদে কুমিরের সাথে লড়াই করা, ইত্যাদি রোমহর্ষক কাহিনির বর্ণনা আছে, সেসব কি সত্যি! না কি লেখার প্রয়োজনেই ও সব লিখে ছিলেন আপনি?'

পার্সেলটা কাছে টেনে নিলেন মৃগাঙ্কমোহন। টেবিলের উপর রাখা একটা পেনসিল কাটার ছুরি তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে পার্সেলের কাপড়টা

BanglaBook.org

কাটতে কাটতে তিনি বললেন, 'যা পড়েছেন সব সত্যি। লেখার প্রয়োজনে কোনো কিছু বানিয়ে লিখিনি আমি। যা পড়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি রোমহর্ষক ঘটনা এরপর আমার জীবনে ঘটেছিল।'

তাপস শুনে বলল, 'তাই নাকি, সেটা কি আপনার বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছিলেন? নিঃশব্দে হেসে মৃগাঙ্ক মোহন বললেন, 'না। সেখানে লিখিনি আমি। কারণ, লেখার কথা থাকলেও সে খণ্ড আর লেখা হয়নি আমার।'

তাপস একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও দ্বিতীয় খণ্ডটা আর প্রকাশই হয়নি। সেটা আর লিখলেন না কেন আপনি?'

পার্সেলের ওপরের কাপড়গুলো খুলে ফেললেন মৃগাঙ্ক মোহন। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে কালো রঙের পালিশ করা কাঠের বাক্স। ছোট্ট একটা ডালা আছে তাতে। বাক্সটা যে অনেক পুরোনো তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কাপড়গুলো খুলে ফেলার পর মৃগাঙ্ক মোহন পরম মমতায় তার গায়ে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, 'জানেন, এ বাক্সটা অনেক অনেক দূর থেকে এসেছে। তবে আসতে অনেক দেরি হল। কত বছর ধরে এর জন্য প্রতীক্ষা করে আছি আমি।'

'হ্যাঁ জানি, কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটা থেকে।'

বাক্সটার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে ভদ্রলোক অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, বোগোটা। সেখানেই তো ঘটেছিল আমার ভ্রমণ পথের সবচেয়ে রোমহর্ষক-রোমাঞ্চকর ঘটনাটা। যা কোথাও লেখা হয়নি আমার।'—এই বলে চুপ করে গেলেন তিনি।

বাইরে ঝড়ের বিরাম নেই। জানলার শার্সিগুলো কেঁপেই চলেছে। তার ঘরের মধ্যে এখন বেশ আরাম লাগছে তাপসের, ফায়ার প্লেসের আঁচে তার শীত শীত ভাবটা কেটে গেছে। শুধু তার একটাই ভয়। ঝড় থামলে ম্যালের হোটেলগুলোর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে না তো? তবে বাইরে যা অবস্থা তাতে এখন বেরোনো তার পক্ষে অসম্ভব। ঝড় না থামা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

কিছুটা তার সামনে বসে থাকা বিখ্যাত পর্যটকের মুখ থেকে কাহিনির শোনার লোভে, আর কিছুটা সময় কাটাবার জন্য এরপর তাপস মৃগাঙ্ক

BanglaBook.org

মোহনের উদ্দেশে বলল, 'বোগোটা শহরে ভ্রমণের সময় যে রোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছিল সে কাহিনি আমাকে বলবেন?'

মৃগাঙ্ক মোহন তাকিয়ে ছিলেন বাক্সটার দিকে। তাপসের কথা শুনে তিনি যেন একটু চমকে উঠে তাকালেন তার দিকে। তারপর তাপসের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি সত্যি শুনতে চান সেই কাহিনি? অবশ্য এই পার্সেলটা যখন আপনি এনেছেন, তখন সে কাহিনি অন্তত আপনাকে জানানো আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু শুনে আপনি ভয় পাবেন না তো?'

প্রশ্ন শুনে তাপস এবার হেসে ফেলে বলল, 'আমাকে কি আপনি একদম বাচ্চা ছেলে ভাবলেন! আপনি বলুন—'

মৃগাঙ্ক মোহনের মুখে ফুটে উঠল একটা চাপা হাসির রেখা। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে তাহলে শুনুন?' কয়েক মিনিট চুপ করে কী যেন ভাবার পর মৃগাঙ্ক মোহন বলতে শুরু করেন তাঁর কাহিনি।

'আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করে মেক্সিকো, গুয়াতোমালা, এল সালভাদর হয়ে, নিকারাগুয়ার সামান্য অংশ ছুঁয়ে, হন্ডুরাসের মধ্যে দিয়ে কোস্টারিকা পৌঁছোতে আমার মাস দুই সময় লেগেছিল। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়ে ছিল সে পথে। কিন্তু সে গল্পে আমি যাচ্ছি না। কোস্টারিকাতে একটা হপ্তা কাটিয়ে একটা আদ্যিকালের পালতোলা মালবাহী জাহাজের কোলে চেপে সামান্য পানামা যোজক পার হয়ে কলম্বিয়ার মাটিতে পা রেখেছিলাম আমি। প্রথমে আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম মেডেলিন শহরে। তারপর আরও এগিয়ে ম্যাগদালেন নদী অতিক্রম করতেই আমার পথ আটকে দাঁড়াল আন্দিজের গিরিশিরা। জনমানবহীন আন্দিজের কন্দরে আমি একমাত্র মানুষ। একটা শকুন পর্যন্ত চোখে পড়েনি সে পথে। কীভাবে যে আমি আন্দিজের সেই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করেছিলাম তা আমিই একমাত্র জানি। অবশেষে কলম্বিয়ার ভূ-খণ্ডে পা রাখার সাতাশ দিন পর আমি উপস্থিত হলাম তার রাজধানী বোগোটা শহরে।'

একটু দম নিয়ে ধীরে ধীরে আবার বলতে শুরু করলেন, 'আজকের বোগোটা শহর অনেক উন্নত হলেও সে সময় বোগোটা ছিল পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একটা ছোট্ট শহর। সোনা আর পান্না ব্যবসায়ী কিছু ইউরোপিয়ান

BanglaBook.org

বাস করত শহরের কেন্দ্রস্থলে। আপনি হয়তো জানেন যে পৃথিবীর অর্ধেক পান্না কলম্বিয়াতে পাওয়া যায়। আর সেখানে বাস করত মাথায় ইগলের পালকের সাজ আর বিচিত্র পোশাক পরা রেড ইন্ডিয়ানরা। সংখ্যায় তারা প্রচুর। শহরের উপকণ্ঠে তারা চাষাবাদ করত। কেউ কেউ আবার কাজ করত ইউরোপিয়ানদের বাড়িতে।

যাই হোক বোগোটা পৌঁছে আমি মনস্থির করলাম, একটা মাস সেখানে কাটাব আমি। আন্দিজ পার হতে যে ধকল গেছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য একটা মাস বিশ্রামের প্রয়োজন। তারপর রওনা হব ব্রাজিলের আমাজন অববাহিকার দিকে। আমার সিদ্ধান্তমতো বোগোটাতে থাকার জন্য এক ইউরোপিয়ানের ফাঁকা বাড়ি ভাড়া নিলাম আমি। একজন যুবক রেড ইন্ডিয়ান চাকরও জুটে গেল—পাচামাকি। বেশ শান্ত প্রকৃতির ছেলে। ইউরোপিয়ানদের সংস্পর্শে খ্রিস্ট ধর্ম নিয়েছে। তবে স্বজাতীর সাথেও যোগাযোগ রেখে চলে। আমরা দু-জনে থাকতে শুরু করলাম সেই ছোট্ট বাড়িটাতে।

'কোনো কাজ নেই। খাই আর ঘুরে বেড়াই এখানে সেখানে। তখন বসন্ত কাল। মনোরম পরিবেশ চারপাশে। পাহাড়ের ঢালে ফুলের সমারোহ। বসন্ত কাল আবার সেখানে রেড ইন্ডিয়ানদের বিবাহের ঋতু। গভীর রাতে শহর লাগোয়া পাহাড়ের মাথার ওপর অবস্থিত ছোটো ছোটো গ্রামগুলো থেকে ভেসে আসত তাদের বিবাহ উৎসবের ঢাকের শব্দ।' আবার একটু থামলেন মৃগাঙ্ক মোহন। এই ফাঁকে একবার জানলার শার্সির দিকে তাকিয়ে নিল তাপস। না, ঝড়ের কোনো বিরাম নেই। বরং তা যেন বেড়েই চলেছে। মুহূর্ত খানেক চুপ করে থাকার পর মৃগাঙ্ক মোহন আবার বলতে আরম্ভ করলেন—

'ভ্রমণের পাশাপাশি আমার অন্য একটা নেশা ছিল। সে নেশা হল মুখোশ সংগ্রহের। এই যে দেওয়াল জুড়ে নানা ধরনের মুখোশ দেখছেন তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম আমি। ডান দিকের বুক কেসের পাশে যে সিংঅলা মুখোশটা আছে ওটা সাইবেরিয়ার। ওই সিং আর চামড়া বল্গা হরিণের। আর ওই যে ডান দিকের দেওয়ালে লম্বাটে দেখতে কাঠের মুখোশটা ওটা হন্ডুরাসের এক উপজাতীয়দের।

'বোগোটা শহরে বাস করার সময় রেড ইন্ডিয়ানদের মুখোশ সম্পর্কে

BanglaBook.org

খোঁজখবর করতে গিয়ে একদিন শুনতে পেলাম তাদের কাছে নাকি এক অদ্ভুত ধরনের মুখোশ পাওয়া যায়। সে ব্যাপারে আরও একটু খোঁজ নেবার পর এক বৃদ্ধ রেডি ইন্ডিয়ানের কাছে দেখলামও সেটা। জিনিসটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মুখোশের মতো দেখতে হলেও সেটা আসলে মুখোশ নয়, সেটা মানুষের কুঁচকানো মাথা, শ্রাঙ্কেন হেড।

তাপস বিস্ময়ে বলে উঠল, 'সত্যিকারের মানুষের মাথা!'

মৃগাঙ্কমোহন বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যিকারের মানুষের মাথা। একরাশ চুলওয়ালা, মুখোশের মতো দেখতে মানুষের কুঁচকানো মাথা। চুল ছাড়াও তার দাঁত ঠোঁট নাক সব থাকে। শুধু চোখের পাতা দুটো সুতো দিয়ে সেলাই করা থাকে, যাতে অশুভ আত্মা তার মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে। পরে অবশ্য বোগোটাতেই এক ইয়োরোপিয়ানের মুখে শুনেছিলাম কীভাবে শ্রাঙ্কেন হেড তৈরি করা হয়। রেড ইন্ডিয়ানরা বিজাতীয় লোককে সুবিধামতো পেলে তার মুণ্ডুসমেত গলা কেটে নেয়। তারপর সেই মাথার ভিতর থেকে চোখ-ব্রেন ইত্যাদি পচনশীল বস্তু বার করে ফেলে গরম পাথর ভরে দেয় সেখানে। এভাবে মাথাটাকে যাবজ্জীবন তারা রেখে দিতে পারে। পাথর ভরার ফলে মাথাটা ছোটো হয়ে কুঁচকে যায় ঠিকই কিন্তু তার অবয়ব মোটামুটি অবিকৃত থাকে। মাথার চুল আরও ঘন মনে হয়।

'বৃদ্ধ রেড ইন্ডিয়ানের কাছে ওই অদ্ভুত জিনিসটা দেখার পর সেটা সংগ্রহের ইচ্ছা জাগল আমার। কিন্তু সেই রেড ইন্ডিয়ান ভয়ে কিছুতেই সেটা আমাকে বিক্রি করতে রাজি হল না। কারণ সরকারি আইন, কোনো রেড ইন্ডিয়ানের কাছে শ্রাঙ্কেন হেড পাওয়া গেল তাকে ফাঁসিতে লটকানো হবে। যদিও ইউরোপিয়ান বা বিদেশিদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়, তবু তার ভয় হল, যদি আমি তার কথা কোথাও বলে ফেলি! কিন্তু শ্রাঙ্কেন হেডটা দেখার পর থেকেই, ওরকম একটা মাথা জোগাড় করার ইচ্ছা আমাকে ভীষণভাবে পেয়ে বসল। পাচামাকির মুখে শুনলাম, তার বাপ-ঠাকুরদার আমলে নাকি রেড ইন্ডিয়ান যুবকরা শ্রাঙ্কেন হেড যৌতুক দিত কন্যাকে। তার বাবাও দিয়েছিলেন তার মাকে। বসন্ত কালে বিবাহ ঋতুতে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত রেড ইন্ডিয়ান যুবকেরা। তারা লুকিয়েও থাকত পাহাড়ের নির্জন পথে। সে পথে একা কোনো ইউরোপিয়ানকে পেলে,

BanglaBook.org

ধারাল কুঠারের এক কোপে তার মুণ্ডু কেটে নিত। বহু ইয়োরোপিয়ানের বা ভিনদেশি মানুষের প্রাণ গেছে তাদের হাতে। এখন অবশ্য সরকারি আইনের ফলে সে প্রথা লোপ পেয়েছে। নিজেরাও অনেকটা সভ্য হয়েছে তারা। তবে প্রথা বজায় রাখতে এখন কাগজের তৈরি প্রতীকি মাথা যৌতুক দেয় রেড ইন্ডিয়ানরা।

'যাই হোক, একটা শ্রাঙ্কেন হেড জোগাড় করার ইচ্ছাটা ক্রমেই বেড়ে চলল আমার। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে, শেষ পর্যন্ত আমি পাচামাকিকে বললাম সে যদি আমাকে সেটা সংগ্রহ করে দেয় তাহলে আমি তাকে মোটারকম বকশিস দেব। একটু দোনোমনো করে শেষ পযন্ত সে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সে বলল, তার জন্য দিন দু-একের ছুটি নিয়ে তাকে গ্রামে যেতে হবে। আমি সানন্দে তাকে ছুটি দিয়ে দিলাম। কিছু আগাম অর্থও দিলাম। সে গ্রামে চলে গেল।

'আমি তার প্রতীক্ষায় বসে রইলাম। কিন্তু দু-দিন কেটে যাবার পরও সে ফিরল না। তারপর একটা-একটা করে দিন কাটতে লাগল। এদিকে আমার বোগোটা ত্যাগ করার সময়ও এগিয়ে আসছে। তার ফেরার আশা ত্যাগ করলাম আমি। এক মাস বোগোটাতে থাকার পর যেদিন আমার সে শহর ত্যাগ করার কথা, ঠিক তার আগের দিন দুপুরে হঠাৎ ফিরে এল পাচামাকি। কিন্তু তার পরনে ইউরোপিয়ান বেশের পরিবর্তে রেড ইন্ডিয়ানদের সেই বিচিত্র পোশাক! মাথায় পালকের সাজ, কোমড়ে ঝুলছে কুঠার! সে আমাকে জানাল, খ্রিস্ট ধর্ম ত্যাগ করে বাপ-ঠাকুরদার সনাতন ধর্মে আবার ফিরে গেছে সে। গ্রামে একটা মেয়ে দেখেছে সে। তাকে বিয়ে করে গ্রামেই থাকবে। তবে এখন সে এসেছে, আমাকে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতি রাখতে। একটা শ্রাঙ্কেন হেডের সন্ধান পেয়েছে সে। সেটা নিতে হলে আমাকে তার সাথে সে দিনই রেড ইন্ডিয়ানদের গ্রামে যেতে হবে।'

তন্ময় হয়ে মৃগাঙ্ক মোহনের গল্প শুনতে লাগল তাপস। তিনি তারপর বলে চললেন, 'শ্রাঙ্কেন হেডের ব্যাপারে আমার এত আগ্রহ ছিল যে আমি তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। ও যেখানে আমাকে নিয়ে যাবে বলল, সে গ্রাম আমার বাসস্থান থেকে মাত্র মাইল চারেক দূরে একটা পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত। ঠিক করলাম, বিকালে সেখানে গিয়ে রাতে

BanglaBook.org

ফিরে আসব। তারপর পরদিন রওনা হব আমাজন উপত্যকার উদ্দেশ্যে। পরদিন নতুন পথে যাত্রা শুরু করার জন্য কিছু গোছগাছের প্রয়োজন ছিল আমার। সারাটা দুপুর ধরে সে কাজে আমাকে সাহায্য করল পাচামাকি। সে আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিল, মালপত্র বাঁধাছাঁদা করল, জুতো পালিশ করল। সব কাজ শেষ হবার পর বিকাল বেলা আমি তার সাথে যাত্রা করলাম তার গ্রামের দিকে।

বসন্তের সুন্দর বিকেল। পাহাড়ের ঢালে নাম-না-জানা নানা ফুল ফুটেছে। বাতাসে ভাসছে তাদের মন পাগল করা সৌরভ। যাত্রা পথে হয়তো কখনো চোখে পড়ছে রেড ইন্ডিয়ানদের কুটির। ছোটো ছোটো শিশুরা খেলছে সেখানে। কোনো সময় দেখা হচ্ছে কোনো রেড ইন্ডিয়ান শিকারির সাথে। বল্লমের মাথায় গাঁথা ছাই রঙের জংলি খরগোশ। এ সব দেখতে দেখতে চলতে লাগলাম আমি। তবে পাচামাকি গ্রামটা যে দূরত্বে বলেছিল তার চেয়ে বেশ কিছুটা দূর বলে মনে হল আমার। যখন গ্রামে পৌঁছোলাম তখন সন্ধ্যে।

গ্রামে মানে গোটা পনেরো কুঁড়েঘর। জনা তিরিশেক নানা বয়সি রেড ইন্ডিয়ান নারী-পুরুষ বাস করে সেখানে। পাচামাকির সাথে আমি সেখানে উপস্থিত হতেই কুঁড়েঘর ছেড়ে বেরিয়ে আমাদের চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল তারা। সেই দলের মধ্যে যেমন মাথায় ইগলের পালকের সাজওয়ালা, মুখমণ্ডলে অসংখ্য বলিরেখা আঁকা দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ, তেমনই আছে পাচামাকির মতো যুবক বা মাথায় দুটো মাত্র পালক গোজা, লম্বা বেনীঅলা রেড ইন্ডিয়ান যুবতীরা। এমনকী কাঠের চুষি কাঠি হাতে কয়েকটা বাচ্চাও সেই দঙ্গালে চোখে পড়ল আমার। তারা আমাকে দেখে নিজেদের মধ্যে তাদের ভাষায় কী যেন বলাবলি করতে লাগল, তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলাম না আমি। সেই ভিড় ঠেলে পাচামাকি আমাকে নিয়ে ঢুকল একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে। আমাকে সে সেই ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করতে বলে বাইরে চলে গেল। আমি বসে রইলাম সেখানে। বাইরে অন্ধকার নেমে এল। এক ঘণ্টা পর সে ফিরে এসে বলল, চলুন এবার বাইরে যাব। একটা অনুষ্ঠান হবে। সেটা শেষ হলে মাথাটা যেখানে আছে, সেখানে আপনাকে নিয়ে যাব।

'বাইরে বেরিয়ে দেখি আকাশে ধীরে ধীরে চাঁদ উঠছে। গোল হয়ে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে থাকা ত্রিভুজাকৃতির কুঁড়েঘরগুলোর ঠিক মাঝখানে খোলা আকাশের নীচে জ্বালানো হয়েছে একটা অগ্নিকুণ্ড। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুখে বিচিত্র উলকি আঁকা রেড ইন্ডিয়ান পুরুষরা। তাদের প্রত্যেকের কোমরে রয়েছে ছোটো আকৃতির ধারাল কুঠার। আর তার কিছু দূরে মাটিতে ভিড় করে বসে আছে মহিলারা। দু-জন ঢাক বাদকও সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। বাইরে বেরিয়ে আমরা গিয়ে বসলাম অগ্নিকুণ্ড থেকে একটু দূরে একটা পাথরের ওপর।

'আমরা সেখানে গিয়ে বসার পর একজন দীর্ঘদেহী সর্দার মতো রেড ইন্ডিয়ান দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন নির্দেশ দিল। তখন আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্ডিয়ানরা নিজেদের কোমর থেকে কুঠার খুলে নিয়ে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে সার বেঁধে দাঁড়াল। বেজে উঠল ঢাক। ঢাকের তালে আর সংগীতের ছন্দে নৃত্য শুরু করল তারা। কখনো আকাশের দিকে মাথা তুলে কুঠার উচিয়ে, কখনো মাটির দিকে ঝুঁকে অগ্নিকুণ্ডকে বৃত্তাকারে পাক খেতে লাগল সকলে। প্রথমে ধীর গতিতে, তারপর দ্রুত লয়ে। চাঁদের আলোতে বসে আমি প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম রেড ইন্ডিয়ানদের সেই অদ্ভুত নৃত্য। তাদের বিচিত্র সংগীত আর বাদ্যযন্ত্রের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পাহাড়ের গায়ে। নাচ দেখতে দেখতে আমি পাচামাকিকে জিজ্ঞেস করলাম, এ নাচ কীসের জন্য? পাচামাকি আমার কথা শুনে সলজ্জে বলল, সামনের চন্দ্রমাসের পাঁচ তারিখে আমার বিয়ে। প্রাক বিবাহ উৎসব পালন করা হচ্ছে এই নাচের মাধ্যমে। মেয়েদের দঙ্গালে বসে থাকা তার নববধূকে সে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়েও দিল। এর কিছুক্ষণ পর যারা নাচছিল তাদের মধ্যে একজন বেরিয়ে এসে আমার পাশে বসে থাকা পাচামাকিকেও তাদের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। কোমর থেকে কুঠার খুলে নিয়ে সেও তাদের সাথে নৃত্য শুরু করল। একলা বসে রইলাম আমি। সময় এগোতে লাগল। নেচে চলল পাচামাকি।

'একসময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি অনেক রাত হয়ে গেছে। জিনিসটা নিয়ে আমাকে ফেরার পথ ধরতে হবে। আর দেরি হলে ফেরা যাবে না। ব্যাপারটা ভেবে নৃত্যরত পাচামাকির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য উঠে দাঁড়ালাম আমি। তখন নাচের ছন্দ একদম চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। রেড ইন্ডিয়ানদের ছন্দবদ্ধ সমবেত পদাঘাতে কেঁপে উঠছে মাটি। তাদের চিৎকার

BanglaBook.org

আর ঢাকের শব্দ পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে! আমি উঠে দাঁড়াবার পর মনে হয় আমাকে লক্ষ করল পাচামাকি, এবং সম্ভবত উঠে দাঁড়াবার কারণও অনুধাবন করল সে। তাই কিছুক্ষণের মধ্যে দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে আমাকে সে বলল, এবার চলুন। আপনার জিনিসটা এবার দিয়ে দিই— আমি বললাম, হ্যাঁ, চলো অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন কোথায় যেতে হবে? কিছু দূরে পাহাড়ের খাদের ধারে একদম একলা দাঁড়িয়ে আছে একটা কুঁড়েঘর। সেটা দেখিয়ে পাচামাকি বলল, ওই যে আমার নতুন ঘর। বিয়ের পর ওখানেই থাকব আমি! ওই ঘরেই রাখা আছে মুণ্ডুটা। আসুন আমার সাথে—! পাচামাকির পিছন পিছন আমি গিয়ে দাঁড়ালাম সেই কুঁড়েঘরের সামনে। ইঙ্গিতে আমাকে তার ভিতরে প্রবেশ করতে বলল সে। প্রথমে ঘরের ভিতর পা রাখলাম আমি। আমার পিছন পিছন পাচামাকি। ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে থেমে গেল রেড ইন্ডিয়ানদের চিৎকার আর ঢাকের শব্দ। ছোট্ট ঘরটাতে কোনো আলো জ্বলছে না। শুধু খোলা দরজা দিয়ে কিছুটা চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের ভিতর। ঘরে ঢুকে আমি পিছন ফিরে পাচামাকিকে বললাম, কোথায় জিনিসটা? আমার কথার উত্তরে পাচামাকি তার বেঁটে কুঠার সমেত হাতটা তার মাথার ওপর তুলে ধরে হেসে বলল, ওই যে ওই দেওয়ালের দিকে তাকান, ওখানে দেওয়ালের কোণে সেটা রাখা আছে। মুখ ফিরিয়ে ঘাড়টা একটু ঝুঁকিয়ে তাকালাম সামনের আধো-অন্ধকার দেওয়ালের দিকে।'

এ পর্যন্ত বলে হঠাৎই চুপ করে গেলেন মৃগাঙ্ক মোহন। তাপস তন্ময় হয়ে তার কাহিনি শুনছিল। মৃগাঙ্ক মোহন থেমে যেতেই তাপসের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'তারপর?'

কয়েক মুহূর্ত তাপসের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি জবাব দিলেন, 'তারপর এই যে—।'

তাপস গল্প শুনতে শুনতে খেয়াল করেনি, কখন যেন তিনি বাইরে বার করে ফেলেছেন বাক্সর ভিতরে রাখা জিনিসটা! মৃগাঙ্ক মোহনের কথা শুনে তাপস তাকাল টেবিলের ওপর তাঁর হাতে ধরা জিনিসটার দিকে। সেটা দেখতে অবিকল যেন একটা মুখোশের মতো। ঘন কালো চুলওয়ালা কুঁকড়ে যাওয়া একটা মানুষের মুখ। নাক, ঠোঁট সব ঠিকই আছে শুধু তার চোখের

BanglaBook.org

পাতা দুটো সুতো দিয়ে সেলাই করা,—শ্রাঙ্কেন হেড! সেটা দেখে বিস্মিত হয়ে তাপস বলে উঠল, 'এই মাথাটাই কি ছিল সেই ঘরের ভিতর? কার মাথা এটা? এরকম ঘন কালো চুল তো ইউরোপিয়ানদের থাকে না!'

একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল মৃগাঙ্ক মোহনের মুখে। আর ঠিক সেই সময় ঝড়ের ঝাপটে খানখান হয়ে গেল জানলার কাচের শার্সি। একরাশ ঠান্ডা বাতাসের ঝলকে নিভে গেল টেবিলে রাখা মোমবাতি। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। শুধু ফায়ার প্লেসের গনগনে আঁচের লাল আভা এসে পড়েছে মৃগাঙ্ক মোহনের মুখে আর তাঁর ডান হাতে ধরা শ্রাঙ্কেন হেডের ওপর। অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাপসের দিকে বিষণ্ণ হাসি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি। হঠাৎ যেন তাপসের মনে হল, এ দুই মুখের মধ্যে বড্ড বেশি মিল! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তাপস। এর পরমুহূর্তে মৃগাঙ্কমোহন বাঁ-হাত দিয়ে তার নিজের ঘাড়ের ওপর থেকে একটানে তার মাথাটা খসিয়ে ফেললেন। ঘাড়ের ওপর শুধু জমাট বাঁধা অন্ধকার!

একটা আর্ত চিৎকার করে উঠল তাপস। তারপর কোনো রকমে সেই অন্ধকার ঘর ছেড়ে ছিটকে বাইরে বেরোল। ঘরের ভিতর থেকে ভেসে এল মৃগাঙ্ক মোহনের গলা, 'এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাচ্ছেন আপনি? গল্পটা তো পুরো বলাই হল না আপনাকে! সেই কুঁড়েঘরের ভিতর কী হল সেটা শুনে যান।'

মৃগাঙ্ক মোহনের গল্পের বাকি অংশ শোনার জন্য তাপস আর সেখানে দাঁড়াল না। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সে ঝড়ের মধ্যেই ছুটতে শুরু করল।

BanglaBook.org

সাত নম্বর খাদান

হঠাৎই একটা ঘস ঘস শব্দ করে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। সুনন্দ তার পাশের ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী হল?'

ড্রাইভার বলল, 'মনে হয় পিছনের একটা টায়ার ফেঁসে গেল!'

সে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। সুনন্দও নীচে নামল। হ্যাঁ, পিছনের বাঁ পাশের টায়ারটা চুপসে গিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে সুনন্দ বলল, 'টায়ারটা পুরোনো নাকি?'

ড্রাইভার একটু আক্ষেপের সুরে বলল, 'না স্যার, একদম নতুন টায়ার। কোলিয়ারির রাস্তা তো, ভারী ভারী ট্রাক চলে। লোহালক্কড়ের টুকরো পড়ে থাকে রাস্তায়, তাতেই মনে হয় ফেঁসে গিয়েছে। এ রাস্তায় এর আগেও একবার আমার এরকম হয়েছে।'

সুনন্দ প্রশ্ন করল, 'এখান থেকে ম্যাকেঞ্জি কোলিয়ারি কত দূর?'

ড্রাইভার দূরে অন্ধকারের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওদিকে ওই যে ওপাশে একটা টিলা দেখা যাচ্ছে, তার আর-একটু ওদিক থেকেই তো কোলিয়ারি শুরু হয়েছে।'

ড্রাইভার যেদিকে দেখাল, সুনন্দ তাকাল সেদিকে। আকাশে চাঁদ থাকলেও তার আলো কেমন যেন ম্লান। সেই আলোয় বেশ কিছু দূরে অস্পষ্ট কয়েকটা টিলা চোখে পড়ল সুনন্দর। গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে সেখান থেকে জায়গাটা আধ মাইল মতো হবে। আর-একটু এগোলেই পৌঁছে যাওয়া যেত সেখানে। সুনন্দ ঘড়ির দিকে তাকাল, রাত ন-টা বাজতে চলেছে। কোলিয়ারিতে গিয়ে কাজ সেরে কাল ভোরেই কলকাতায় ফিরতে হবে। তার কোম্পানির সেই রকমই নির্দেশ। ড্রাইভার গাড়ির ডিকি খুলে যন্ত্রপাতি নামাতে শুরু করল চাকাটা পালটে ফেলার জন্য। সুনন্দ তাকে বলল, 'তোমার কত সময় লাগবে?'

BanglaBook.org

ড্রাইভার বলল, 'বেশিক্ষণ নয়, আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে।'

চারপাশে গুমোট গরম, আকাশে মেঘ আছে, তার আড়ালে মাঝে মাঝে ঢেকে যাচ্ছে চাঁদ। এখানে এর আগে কোনোদিন আসেনি সুনন্দ। সে যে কোম্পানিতে চাকরি করে তাদের বেশ কয়েকটা কয়লাখনি আছে এ অঞ্চলে। কোম্পানি তাদের গাড়িতে সুনন্দকে পাঠিয়েছে ম্যাকেঞ্জি খনি থেকে একটা রিপোর্ট সংগ্রহ করে হেড অফিসে জমা দেওয়ার জন্য। কোলিয়ারির ম্যানেজারের রিপোর্ট তৈরি করে রাখার কথা। সুনন্দ অফিসে তার উপরওয়ালার মুখ থেকে যতটুকু শুনেছে, তাতে সে জানতে পেরেছে যে, কোম্পানি সম্ভবত বন্ধ করে দেবে তাদের খনি।

হঠাৎই তার কানে এল একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। শব্দটা শুনে সুনন্দ

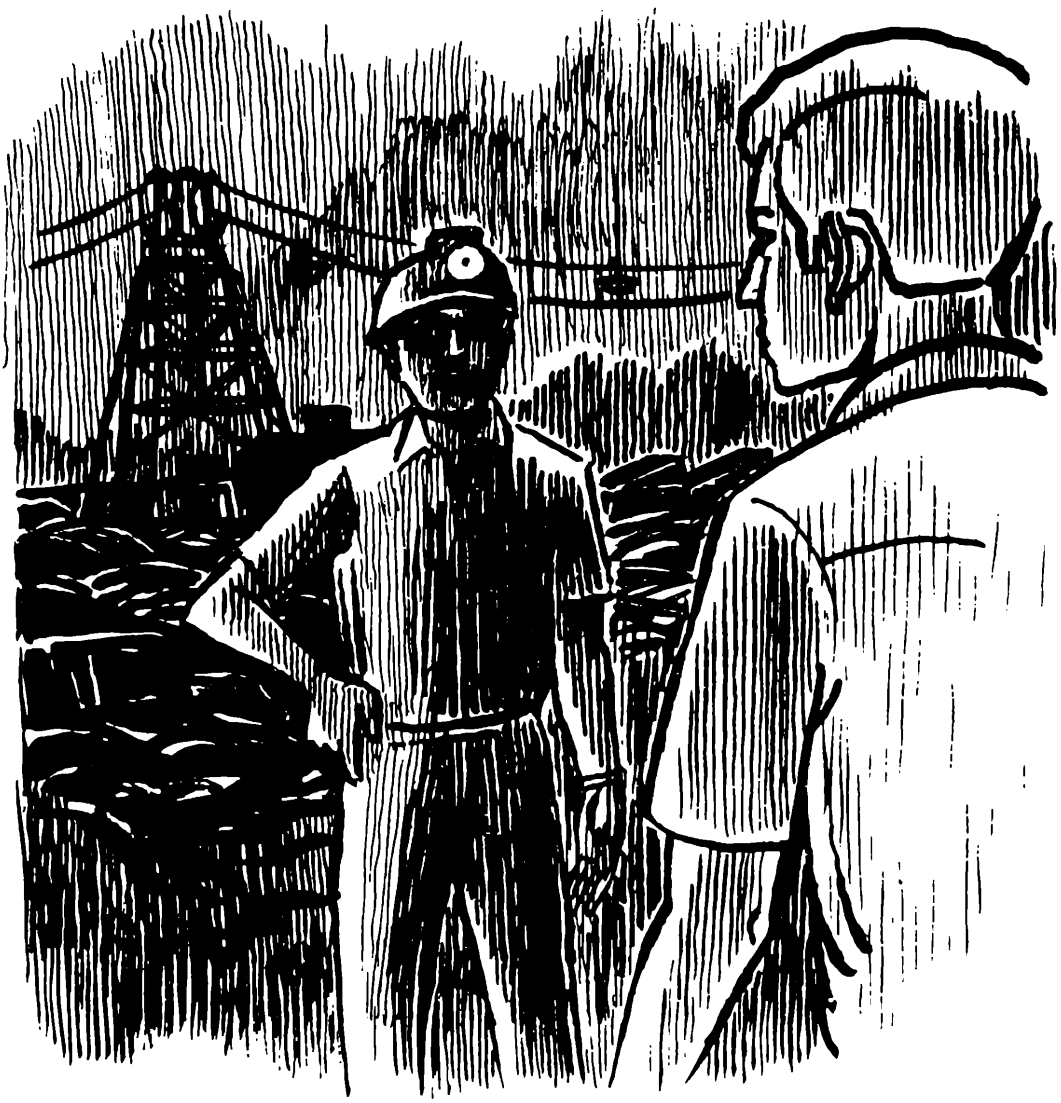

ভালো করে ঠাওর করবার পর বুঝতে পারল, অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে রাস্তার পাশের মাঠের ভিতর দিয়ে একটা গাড়ি যেন এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। গাড়িটায় কোনো আলো নেই, শুধু তার শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। শব্দটা কানে গিয়েছে সুনন্দর ড্রাইভারেরও, সে-ও উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল সেদিকে। তারপর বলল, 'মনে হয় একটা জিপ আসছে।'

গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কি ম্যাকেঞ্জি খনিতে যাওয়ার জন্য কলকাতা থেকে আসছেন?'

তাঁর প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গেল সুনন্দ। উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আপনি?'

গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন ভদ্রলোক। তাঁর পরনে সাদা জামা-প্যান্ট। ভদ্রলোকের বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। ভদ্রলোক সুনন্দকে নমস্কার করে বললেন, 'আমি ম্যাকেঞ্জি কোলিয়ারির ম্যানেজার। কোম্পানির হেড অফিস থেকে তার পেয়েছি আপনি আসছেন। দেরি হচ্ছে দেখে আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছি।'

এই ভদ্রলোকের থেকেই সুনন্দর রিপোর্ট সংগ্রহ করার কথা। সুনন্দ ভদ্রলোকের কথা শুনে প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলল, 'আমি আগেই পৌঁছে যেতাম। আসলে দুর্গাপুরের কাছে একটা জ্যামে আটকে থাকতে হয়েছিল ঘণ্টা দুয়েক, তারপর এ পর্যন্ত এসে আবার গাড়িটা পাংচার হয়ে গেল।'

ভদ্রলোক বললেন, 'এত দূর আসতে রাস্তায় নিশ্চয়ই আপনার খুব ধকল গিয়েছে। এদিকের রাস্তাঘাট তো বেশ ভাঙাচোরা।'

কথাটা ভুল বলেননি ভদ্রলোক। শেষ মাইল কুড়ি পথ আসতে আসতে সুনন্দর মনে হচ্ছিল, ঝাঁকুনিতে তার হাড়-পাঁজর যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের কথার জবাবে সুনন্দ বলল, 'হ্যাঁ, একটু ধকল গেল।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি বরং সামনের রাস্তাটুকু আমার জিপে চলুন। বেশিক্ষণের পথ নয়, মাত্র মিনিট পনেরো লাগবে।'

তাঁর কথা শুনে সুনন্দ তাকাল তার ড্রাইভারের দিকে। ড্রাইভার বলল, 'আপনি ওঁর সঙ্গে চলে যান, আমি পৌঁছে যাব ওখানে।'

সুনন্দ ড্রাইভারকে বলল, 'তুমি এই অন্ধকার রাস্তার মধ্যে গাড়ি নিয়ে একলা থাকবে নাকি! তার চেয়ে বরং গাড়িটা সারিয়ে নাও, তারপর এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।'

BanglaBook.org

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই সেই ভদ্রলোক বললেন, 'ওর জন্য আপনার চিন্তা নেই, আমি একজন লোক এখানে রেখে যাচ্ছি।'

এই বলে তিনি 'মংলু' বলে একটা হাঁক দিতেই জিপের পিছন দিক থেকে নেমে এল একজন। লোকটি মনে হয় সাঁওতাল শ্রমিক গোছের, তার শরীরের কালো রং যেন মিশে গিয়েছে অন্ধকারের সঙ্গে। সে নীচে নেমে দাঁড়াবার পর তার ড্রাইভার বলল, 'আপনি যান না, এরকম অন্ধকার রাস্তায় একলা থাকার অভ্যেস আমার আছে। তা ছাড়া ম্যানেজারসাহেব একজন লোক তো রেখেই যাচ্ছেন, আপনি ভাববেন না।'

যদিও ভদ্রলোক নিজেকে ম্যানেজার বলে পরিচয় দিচ্ছেন, আর সুনন্দর এই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই রিপোর্টটা নেওয়ার কথা, কিন্তু ইনিই সত্যি সত্যি ম্যানেজার তো? অচেনা লোকের গাড়িতে চড়ে বসার আগে পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া দরকার। ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন সুনন্দর মনের কথা। তিনি একটু হেসে সুনন্দকে বললেন, 'এই অন্ধকার রাস্তার মাঝে হঠাৎ এসে হাজির হলাম বলে আপনি হয়তো ভাবছেন আমি সত্যিই ম্যানেজার কি না! আপনার ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করুন, ও আমাকে এর আগে দেখেছে।'

ড্রাইভার বলল, 'হ্যাঁ স্যার, উনিই ম্যানেজারসাহেব। আগে যখন এখানে কোম্পানির সাহেবদের নিয়ে এসেছিলাম, তখন ওঁকে দেখেছি।'

সুনন্দ একটু লজ্জা পেল। সে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ঠিক আছে, চলুন আপনার গাড়িতেই যাওয়া যাক।'

ভদ্রলোক মংলু নামের লোকটিকে সেখানে থেকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে চেপে বসলেন জিপে। সুনন্দও তার নিজের গাড়ি থেকে ব্রিফকেসটা বের করে নিয়ে উঠে পড়ল জিপে। ভদ্রলোক চাবি ঘুরিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করতেই গাড়িটা গোঁ-গোঁ শব্দ করে উঠল। গাড়ির মুখটা প্রথমে ঘুরে গেল, তারপর রাস্তা ধরে চলতে লাগল। গাড়িতে হেডলাইট নেই, সুনন্দ তাই প্রশ্ন করল, 'লাইট ছাড়া আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন কীভাবে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট আমি হাতের তালুর মতো চিনি, অন্ধকারে তাই আমার কোনো অসুবিধে হয় না।'

সুনন্দ বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই অনেককাল আছেন এখানে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, অনেক দিন, তা প্রায় তিরিশ বছর হবে।'

BanglaBook.org

সুনন্দর হঠাৎ খেয়াল হল ভদ্রলোকের নামটা এখনও পর্যন্ত জানা হয়নি। তাই বলল, 'আচ্ছা আপনার নামটা কী?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম নীলমাধব মজুমদার। যদিও এ নামে আমাকে এখানে কেউ খুঁজে পাবে না। সকলেই আমাকে এখানে ম্যানেজারবাবু বলেই ডাকে। এ পরিচয়ের আড়ালে আমার আসল নামটাই হারিয়ে গিয়েছে।'

সুনন্দ কোনো কথা বলল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। তার হঠাৎ চোখে পড়ল কিছুটা দূরে অন্ধকারে একটা রেখা যেন চিকচিক করছে। সুনন্দ প্রশ্ন করল, 'ওটা কী?'

গাড়ির স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে নীলমাধব বললেন, 'ওটাই হল দামোদর নদ, আমাদের খাদানের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। খাদান কাকে বলে জানেন তো?'

খাদান কয়লাখনির গর্তকে বলে সুনন্দ জানে সেটা। সে বলল, 'হ্যাঁ বুঝি।'

টিলা থেকে নামতে শুরু করল জিপ। নীচে নেমে কিছু দূর এগোবার পরই সুনন্দ বুঝতে পারল তারা কোলিয়ারি অঞ্চলে ঢুকছে। মাঝে মাঝেই রাস্তার দু-পাশে ডাঁই করে রাখা আছে কয়লা, চোখে পড়ল বেশ কয়েকটা ওয়াগনও। কয়লার পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে কিছুটা এগিয়ে তারা ঢুকল একটা রাস্তায়। তার দু-পাশে খাপড়ার নীচু ছাদওয়ালা সার সার বাড়িঘর। মনে হয় শ্রমিকদের বস্তি। কিন্তু কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না। লোকজনও চোখে পড়ছে না। মিনিট পাঁচেক চলার পর আবার বাঁক নিল গাড়ি। তারপর কয়লার স্তূপের মধ্যে দিয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল জিপটা। নীলমাধববাবু বললেন, 'আমরা এসে গিয়েছি।'

২

গাড়ি থেকে ব্রিফকেসটা নিয়ে নেমে পড়ল সুনন্দ। নেমে পড়লেন নীলমাধববাবু। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা পুরোনো আমলের বাড়ি। বাড়িটা দেখে সুনন্দর ধারণা হল, ভালো করে পরিচর্যা করা হয় না, বেশ কিছু ঝোপজঙ্গল জন্মে গিয়েছে বাড়ির চারপাশে। গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে নীলমাধববাবু বললেন, 'সাহেবরা যখন

BanglaBook.org

প্রথম এখানে এসে খনি ব্যাবসা চালু করে, তখন এটাই ছিল খনির অফিসবাড়ি। এখন অবশ্য কয়েক বছর ধরে নতুন অফিসবাড়ি তৈরি হয়েছে তিন নম্বর খাদানের কাছে।'

সুনন্দ প্রশ্ন করল, তাহলে এ বাড়িটা?'

সদর দরজার তালাটা খুলতে খুলতে নীলমাধববাবু বললেন, 'আমি এ বাড়িটায় থাকি।'

'আপনি একলা থাকেন এখানে? আপনার ফ্যামিলি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'সারা জীবন এই কয়লাখনির শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করতে করতেই সময় কেটে গেল, বিয়ে-থা আর আমার করা হয়নি। তাই বলতে পারেন ঠিক ফ্যামিলি বলতে যা বোঝায়, তা আমার নেই। খাদানে যে শ্রমিকরা কাজ করে, বলতে পারেন ওরাই আমার ফ্যামিলি।'

বাড়ির ভিতরটা অন্ধকার। দরজা খোলার পর নীলমাধববাবুর পিছন পিছন সুনন্দ একটা ঘর পেরিয়ে ঢুকল আর-একটা ঘরের মধ্যে। ঘরে ঢোকার পর একটা লন্ঠন জ্বালালেন। মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। ঘরটা বেশ বড়ো, দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো আছে সার সার লোহার আলমারি, সেলফ। তার মধ্যে গাদা করে রাখা আছে পুরোনো কাগজপত্র, ছেঁড়া ফাইল ইত্যাদি। ঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা আছে একটা বড়ো টেবিল। তার এক পাশে একটা পুরোনো গদি-লাগানো চেয়ার, অন্য পাশে কয়েকটা হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ার। টেবিলের উপর রাখা আছে কিছু ফাইলপত্র, পেপার ওয়েট, কলমদানি ইত্যাদি। লন্ঠনটা টেবিলে রেখে সুনন্দকে একটা চেয়ারে বসতে বলে, গদি দেওয়া চেয়ারটায় বসলেন নীলমাধববাবু। সুনন্দও ব্রিফকেসটা টেবিলের উপর রেখে একটা চেয়ারে নীলমাধববাবুর মুখোমুখি বসল। লন্ঠনের আলোয় সুনন্দ দেখতে পেল নীলমাধববাবুর মুখটা। তার চেয়ে তাঁর বয়স কিছুটা বেশি হবে বলে মনে হল সুনন্দর। তাঁর মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, সাদা ছোপ লেগেছে গোঁফে। তবে তাঁর মেদহীন শরীর দেখে মনে হল, ভদ্রলোক এখনও যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করল সুনন্দ, ভদ্রলোকের চোখ-মুখের ভাব কেমন যেন বিষণ্ণ।

চেয়ারে বসার পর সুনন্দ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে চলে গেল কাজের কথায়। নীলমাধববাবুকে বলল, 'যে রিপোর্টটা আমার হাতে

BanglaBook.org

আপনার দেওয়ার কথা সেটা তৈরি তো? কাল বিকেলের মধ্যেই কিন্তু রিপোর্টটা আমাকে হেড অফিসে জমা দিতে হবে।'

নীলমাধববাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তৈরি করে রেখেছি।' এর পর তিনি টেবিলের একটা ড্রয়ার থেকে রেক্সিনমোড়া একটা কভার ফাইল বের করে এগিয়ে দিলেন সুনন্দর দিকে।

সুনন্দ ফাইলটা খুলল। একগোছা টাইপ করা কাগজপত্র রাখা আছে। কাগজপত্রগুলো অবশ্য কী, তা দেখার কোনো দরকার নেই সুনন্দর। তার উপর শুধু নির্দেশ আছে, ম্যানেজারের কাছ থেকে কাগজপত্রগুলো নিয়ে হেড অফিসে জমা দেওয়ার। ব্যস, ওই পর্যন্তই তার কাজ। তাই ফাইলটা আবার বন্ধ করে ফেলল সে। নিজের ব্রিফকেসে ফাইলটা রেখে দেওয়ার পর সুনন্দ তাকাল নীলমাধববাবুর দিকে। সুনন্দর আসল কাজ চট করে শেষ হয়ে গেল। এখন রাতে তার মাথা গোঁজার ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে জেনে নিতে হবে নীলমাধববাবুর কাছ থেকে।

নীলমাধববাবু বললেন, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

সুনন্দ বলল, 'করুন।'

নীলমাধববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কোম্পানি কি খাদান বন্ধ করে দেবে?'

তাঁর প্রশ্নের কী উত্তর দেবে ঠিক বুঝতে পারল না সুনন্দ। এ ব্যাপারটা সেও শুনেছে। তবে তার সত্যতা কতটা তা সুনন্দর জানা নেই। সবটাই শোনা কথা। তাই বলল, 'কী জানি, সবই তো মালিকদের ব্যাপার।'

নীলমাধববাবু বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'আমি কিন্তু বুঝতে পারছি খাদান বন্ধ হয়ে যাবে, সে জন্যই রিপোর্টটা চেয়ে পাঠিয়েছে ওরা।' একটু থেমে নীলমাধববাবু প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা বলতে পারেন, খাদান যদি সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে শ্রমিকদের কী হবে? এখানকার মাটি তো কালো পাথর, দিনের বেলায় বাতাস আগুন ছড়ায়, চাষবাস হয় না। খাদানের পারিশ্রমিকের উপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে মানুষগুলো। কী হবে ওদের?'

কথাগুলো অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়েও মনে এসেছিল সুনন্দর। সে বলল, 'আপনি ওদের কথা খুব ভাবেন, তাই না?'

নীলমাধববাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ওরাই তো আমার সবকিছু। ওদের নিয়েই তো জীবনটা কাটিয়ে দিলাম।'

BanglaBook.org

সুনন্দ চুপ করে রইল। এ প্রসঙ্গে আর কিছু আলোচনা করা উচিত কি না বুঝে উঠতে পারল না।

আবার মুখ খুললেন নীলমাধববাবু। সুনন্দর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি আমার একটা কাজ করে দেবেন?'

তাঁর গলায় অনুরোধের স্পষ্ট সুর বুঝতে পারল সুনন্দ। জিজ্ঞেস করল, 'বলুন, সম্ভব হলে করব।'

নীলমাধববাবু বললেন, 'একটা কাগজ আপনাকে পৌঁছে দিতে হবে হেড অফিসে। একটা ক্ষতিপূরণের ব্যাপার আছে। খাদান বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে যদি কাগজটা হেড অফিসে পৌঁছোনো যায়, তা হলে কিছু গরিব মানুষ আর ক-টা দিন হয়তো বাঁচতে পারে।'

সুনন্দ বলল, 'ঠিক আছে, কাগজটা আপনার নাম করে হেড অফিসে জমা দিয়ে দেব।'

তার কথা শুনে ম্লান হাসি ফুটে উঠল নীলমাধববাবুর মুখে। তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ, খুব উপকার করবেন আপনি। কিন্তু কাগজটা তো এখানে নেই, অন্য জায়গায় আছে। আপনি কোনোদিন খাদান দেখেছেন?'

সুনন্দ বলল, 'না।'

নীলমাধববাবু বললেন, 'দেখবেন নাকি খাদান? আপনাকে যে কাগজটা দেব সেটা সাত নম্বর খাদানের ভিতর রাখা আছে। চলুন, আপনার খাদান দেখাও হবে আর একা একা বসে থাকতেও হবে না।'

সুনন্দ অবাক হয়ে বলল, 'রাতেও খাদানে কাজ হয় নাকি?'

নীলমাধববাবু বললেন, 'সব সময় না হলেও কোনো কোনো সময় হয়। এই মুহূর্তে তিরিশ জন শ্রমিক রয়েছে সেখানে।'

সে বলল, 'ঠিক আছে চলুন, কিন্তু আমার গাড়িটা এখনও এল না।'

নীলমাধববাবু বললেন, 'চিন্তা করবেন না, গাড়ি ঠিক চলে আসবে।'

BanglaBook.org

৩

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সুনন্দ দেখতে পেল, চাঁদ ঢেকে গিয়েছে মেঘের আড়ালে। চারদিক অন্ধকার। আকাশের কোণে একবার বিদ্যুতের ঝিলিক চোখে পড়ল তার, হয়তো বৃষ্টি নামবে। অন্ধকার রাস্তায় সুনন্দকে নিয়ে

হাঁটতে শুরু করে নীলমাধববাবু বললেন, 'দেখবেন খনির ভিতর কী অসম্ভব পরিশ্রম করে শ্রমিকরা।'

অন্ধকারের মধ্যে মিনিট পাঁচেক চলার পর সুনন্দ যেখানে এসে হাজির হল, তার চারদিক ছোটো-বড়ো কয়লার পাহাড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। একপাশে রাখা আছে সার সার ট্রলি। ওতেই কয়লা নীচ থেকে রেল লাইনের মতো লাইনের উপর দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে উপরে আনা হয়। কাছেই একটা বড়ো ওয়াচটাওয়ার অন্ধকারে ভূতের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই একটা জায়গা উঁচু জাল দিয়ে ঘেরা। টর্চ জ্বাললেন নীলমাধববাবু। জালে ঘেরা জায়গাটার ভিতর ঢোকার জন্য একটা দরজা মতো আছে। সুনন্দ দেখল তার মাথার উপর লটকানো একটা টিনের সাইনবোর্ডে হিন্দিতে লেখা আছে 'সাত নম্বর খাদান, ম্যাকেঞ্জি কোলিয়ারি'। জালে ঘেরা জায়গাটায় ঢোকার পর নীলমাধববাবু বললেন, 'এ খাদানে লিফট নেই, পায়ে হেঁটে নামতে হবে। তবে আপনার কোনো ভয় নেই।' এই বলে তিনি টর্চের আলো ফেললেন সামনের জমির উপর।

সুনন্দ দেখতে পেল বিরাট একটা গহ্বর হাঁ করে আছে সেখানে। রেল লাইনের মতো ট্রলির লাইন এগিয়ে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছে সেই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে। নীলমাধববাবু টর্চ জ্বালিয়ে ঢুকলেন গহ্বরের মধ্যে, পিছনে সুনন্দ। ঢালুপথ ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। নামতে নামতে নীলমাধববাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি ভয় করছে?'

মনের ভিতর একটু ভয় ভয় করলেও সুনন্দ মুখে বলল, 'না।'

আনুমানিক চার-পাঁচ-তলা বাড়ির সমান নীচে নামার পর যেন আলোক রেখা চোখে পড়ল সুনন্দর। অস্পষ্ট শব্দও যেন কানে আসতে লাগল। আর-একটু নীচে নেমে সুনন্দ হাজির হল একটা প্রায় সমতল জায়গায়। সে জায়গাটা ঠিক যেন নীচু ছাদওয়ালা বিরাট হলঘরের মতো। সেখানে দেওয়ালের গায়ে হলদেটে আলো জ্বলছে। লম্বা ধরনের ঘরটার শেষ প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে ঠক ঠক শব্দ। কালো কয়লার দেওয়ালে গাইতি চালাচ্ছে শ্রমিকরা। নীলমাধববাবুর সঙ্গে সুনন্দ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছে সেখানে। ওখানে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকটা সুড়ঙ্গও চোখে পড়ল সুনন্দর। তার ভিতর থেকেও গাঁইতি

BanglaBook.org

চালানোর ঠক ঠক শব্দ ভেসে আসছে। ঠিক যেন যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে লোকগুলো। খনির ভিতর জ্বলতে থাকা ঘোলাটে আলোয় মনে হচ্ছে তারা যেন ঠিক মানুষ নয়, কালো ছায়ামূর্তি। কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর নীলমাধববাবু বললেন, 'দেখছেন তো কত পরিশ্রম করে ওরা!'

সুনন্দ বলল, 'হ্যাঁ, সত্যিই অমানুষিক পরিশ্রম!'

নীলমাধববাবু তারপর বললেন, 'আসুন, কাজটা সেরে ফেলি।' এই বলে তিনি এগিয়ে গেলেন ঘরের একটা কোণের দিকে। সেখানে একটা অতি সাধারণ কাঠের টেবিল আর দুটো চেয়ার রাখা আছে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন তিনি। সুনন্দও বসল একটা চেয়ারে। টেবিলের উপর একটা বাতি আর-একটা মোটা খাতা রাখা আছে। নীলমাধববাবু চেয়ারে বসে খাতাটা টেনে নিয়ে বললেন, 'এটা হল হাজিরা খাতা, এখন যারা কাজ করছে তাদের নাম, ঠিকানা লেখা আছে।' এই বলে কাগজ, কলম বের করে খাতা থেকে কয়েকটি নাম-ঠিকানা টুকতে থাকলেন। সুনন্দ তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

হঠাৎ পায়ের পাতায় কীসের স্পর্শ অনুভব করল সুনন্দ। নীচের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেল, হঠাৎই যেন ঘরের মেঝেটা ইঞ্চি খানেক জলে ডুবে গিয়েছে। একটু আগেই তো মেঝেটা শুকনো খটখটে ছিল! তা হলে জল এল কোথা থেকে? পা-টা একটু উঠিয়ে বসল সুনন্দ। এক মনে লিখে চলেছেন নীলমাধববাবু। কয়েক মুহূর্ত পরই সুনন্দর মনে হল, আবার যেন জল ছুঁয়ে যাচ্ছে তার পা। হ্যাঁ সত্যিই জল যেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আরও ইঞ্চি খানেক উপরে উঠে এসেছে। নীলমাধববাবুর কোনো ভাবান্তর নেই। সুনন্দ দেখতে পেল টেবিলের নীচে নীলমাধববাবুর গোড়ালি পর্যন্ত জলে ডুবে গিয়েছে।

এবার সে বাধ্য হয়েই নীলমাধববাবুকে বলল, 'এ কী, এত জল এসে গেল কীভাবে? আমার পা তো জলে ভিজে যাচ্ছে!'

নীলমাধববাবু লিখতে লিখতে বললেন, 'দামোদরের জল।'

সুনন্দ তাকিয়ে রইল নীলমাধববাবুর দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর লেখা শেষ করে নীলমাধববাবু যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন জল আরও উপরে উঠে

BanglaBook.org

গিয়েছে। নীলমাধববাবু তাঁর কাগজটা হাতে নিয়ে বললেন, 'ব্যস, কাজ শেষ, চলুন, ফেরা যাক।'

জল ভেঙে উপরে উঠছেন নীলমাধববাবু। তাঁর পিছন পিছন সুনন্দ। পথের মুখটায় একবার পিছনের দিকে ফিরে তাকাল সুনন্দ। ঘরের যেদিকে লোকগুলো কাজ করছে সেদিকটা বেশি ঢালু। সুনন্দ দেখতে পেল, তাদের হাঁটুর উপর পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে জলে। তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, আগের মতোই গাইতি চালিয়ে যাচ্ছে তারা। প্রতি মুহূর্তেই জল যে বেড়ে চলেছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না সুনন্দর। নীলমাধববাবুর পিছনে উঠতে উঠতে সুনন্দ বলল, 'ঘরটা যে জলে ভরে গেল, লোকগুলো কি এখনও কাজ করবে?'

কোনো উত্তর দিলেন না নীলমাধববাবু। চুপচাপ উঠতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত পর সুনন্দ জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের খাদানের জল বাইরে বের করার জন্য পাম্পের ব্যবস্থা নেই?'

একটা অদ্ভুত হাসি হেসে জবাব দিলেন নীলমাধববাবু, 'আছে, আছে। কিন্তু গোটা দামোদরটাকে তো আর পাম্প দিয়ে শুষে নেওয়া যায় না!' এর পর একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'একটু দ্রুত পা চালাতে হবে। এখনই তো জল আমাদের পিছু ধাওয়া করবে।'

সুনন্দ অবাক হয়ে বলল, 'মানে?'

কোনো উত্তর দিলেন না নীলমাধববাবু। তিনি যেন বাতাসের বেগে উপরে উঠতে লাগলেন। তাঁর পিছন পিছন প্রায় ছুটতে শুরু করল সুনন্দ। আর তার মনে হতে লাগল, তাদের পিছন পিছন আরও কী একটা যেন উপর দিকে উঠে আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই খাদানের মুখটার ঠিক বাইরে বেরিয়ে এল সুনন্দ। বাইরে তখন শুরু হয়েছে মুষলধারে বৃষ্টি। তাঁরা দু-জনের সঙ্গোসঙ্গো ভিজে গেলেন। বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়িয়ে নীলমাধববাবুর দিকে তাকিয়ে হাঁফাতে লাগল সুনন্দ। খনির ভিতর জলের ব্যাপারটা, আর কেন ঝড়ের বেগে নীলমাধববাবু উপরে উঠলেন, তা ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না সুনন্দর। কয়েক মুহূর্ত সুনন্দর দিকে তাকিয়ে থাকার পর নীলমাধববাবু টর্চ আর তাঁর কাগজটা হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, কাগজটা কিন্তু দয়া করে পৌঁছে দেবেন। আমি এবার যাই!'

সুনন্দ অবাক হয়ে বলল, 'কোথায়?'

BanglaBook.org

নীলমাধববাবু বললেন, 'এত দিন যাদের সঙ্গো কাটালাম তাদের কাছে।'

সুনন্দ কিছু বুঝে ওঠার আগেই নীলমাধববাবু ঢুকলেন খাদানের অন্ধকার গহ্বরে। ঠিক সেই সময় কাছেই কোথাও যেন প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। চমকে উঠল সুনন্দ। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সে চিৎকার করে বলল, 'নীলমাধববাবু শুনুন, এভাবে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

তার কথার কোনো উত্তর এল না। সুনন্দ টর্চটা জ্বালিয়ে আলো ফেলল খাদানের ভিতর। সে দেখতে পেল, জল প্রায় খাদানের মুখ পর্যন্ত উঠে এসেছে। মুহূর্তের জন্য একবার যেন নীলমাধববাবুকে দেখতে পেল সুনন্দ, আর তার পরেই তিনি নিমেষে হারিয়ে গেলেন জলপূর্ণ খাদানের গভীরে। সুনন্দ চিৎকার করে উঠল, 'নীলমাধববাবু . . .!' আর তার পরেই জ্ঞান হারাল সুনন্দ।

পরদিন সকালে কোলিয়ারির রেস্টরুমের বিছানায় জ্ঞান ফেরার পর সুনন্দ যখন উঠে বসল তখন সে দেখতে পেল, তার বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারই গাড়ির ড্রাইভার ও আর-একজন সাদা জামা-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক। সেই ভদ্রলোক নিজেকে কোলিয়ারির ম্যানেজার বলে পরিচয় দিয়ে বললেন, 'কী মশাই, আপনি সাত নম্বর খাদানের কাছে চলে গিয়েছিলেন কীভাবে! আপনার ড্রাইভার আর আমি অনেক খোঁজার পর আপনাকে পেয়েছি।'

তাঁর কথা শুনে সুনন্দ বলল, 'আপনি ম্যানেজার। তাহলে নীলমাধববাবু?'

তার কথা শুনে একটু চুপ করে থাকার পর ভদ্রলোক বললেন, 'নীলমাধববাবুর সঙ্গো আপনার পরিচয় ছিল বুঝি? কিন্তু তিনি আর এখন নেই।'

'নেই মানে?' সুনন্দ আবার জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোক বললেন, 'ঘটনাটা হয়তো আপনার জানা নেই। মাস তিনেক আগে গার্ড-ওয়াল ভেঙে দামোদরের জল এক রাতে ঢুকে পড়ে সাত নম্বর খাদানে। নীলমাধববাবু আর জনাতিরিশেক লোক তখন কাজ করছিলেন। তাঁরা কেউই আর বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি। সকলেরই সলিল সমাধি ঘটে। নীলমাধববাবুর পর আমি ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।'

BanglaBook.org

এর পর ভদ্রলোক সুনন্দকে বললেন, 'আপনি এখানে বিশ্রাম নিন। আপনার রিপোর্টটা তৈরি আছে। আমি অফিস থেকে সেটা নিয়ে আসছি।' বলে ভদ্রলোক ঘর ছেড়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বিছানায় বসে থাকার পর সুনন্দ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, 'মংলু বলে যে লোকটাকে কাল রাতে ম্যানেজারবাবু গাড়ি থেকে তোমার কাছে নামিয়ে দিয়েছিলেন, সে কোথায় গেল?'

'আপনারা চলে যাওয়ার পর তার দেখা আমি আর পাইনি।' বলল ড্রাইভার। এর পর সে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সুনন্দর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এ কাগজটা নিন, আপনার হাতে ছিল কাগজটা।'

কাগজটা হাতে নিয়ে সেটা খুলল সুনন্দ। তার মধ্যে লেখা আছে একটা নামের তালিকা। সে তালিকার মধ্যে মংলু বলেও একটা নাম আছে। আর তালিকার নীচে আছে একটা সই, নীলমাধব মজুমদার, ম্যানেজার, ম্যাকেঞ্জি কোলিয়ারি। কাগজটা যত্ন করে পকেটে রেখে দিল সুনন্দ। এ কাগজটা তাকে হেড অফিসে জমা দিতে হবে।

BanglaBook.org

জগবন্ধুর হারমোনিয়াম

অনেকদিন ধরেই জগবন্ধু একটা হারমোনিয়াম কিনবেন বলে ভাবছিলেন, জগবন্ধু যে গানবাজনা করেন তা কিন্তু নয়, তবে ওসব শুনতে তাঁর খুব ভালো লাগে। মাঝে মাঝে হয়তো গুনগুন করে কোনো গানের কয়েক কলি আনমনে গেয়েও ফেলেন তিনি।

একদিন যখন অফিস ছুটির সময় জগবন্ধু এরকম গুনগুন করছিলেন, তখন সরখেলদা পিছন থেকে এসে পিঠ চাপড়ে বললেন, 'বাঃ, জগবন্ধু তোমার গানের গলাটা তো মন্দ নয়। একটা হারমোনিয়াম কিনে বাড়িতে রেওয়াজ করলে তো পারো। একলা মানুষ, এতে তোমার সময়ও কেটে যাবে।'

তার কথা শুনে জগবন্ধু লাজুক হেসে বলেছিলেন, 'কী যে বলেন দাদা, আমার গলা শুনে হয়তো লোকে বাড়িতে ঢিল ছুড়বে।'

জগবন্ধু মুখে যাই বলুন না কেন, সরখেলদার কথাটা কিন্তু মনে ধরেছিল তাঁর। কিন্তু হারমোনিয়াম আর কেনা হয়ে উঠছিল না।

সেদিন শনিবার। এমনিতেই অফিস হাফ ছুটি, তার ওপর টিভিতে ভারত-পাকিস্তানের ওয়াড-ডে। তাই অফিস আজ শুনশান। অফিস ছুটি হওয়ার কিছু আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন জগবন্ধু। হাঁটতে হাঁটতে নিউ মার্কেটের মধ্যে দিয়ে ফেরবার সময় হঠাৎই চোখে পড়ে গেল দোকানটা। সাইনবোর্ডে লেখা আছে—ইসমাইল কনসার্ট, এখানে পুরাতন বাদ্যযন্ত্র ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

সাইনবোর্ড চোখে পড়তেই জগবন্ধুর মনের ইচ্ছাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সেদিন পকেটে বেশ কিছু বাড়তি টাকাও ছিল। জগবন্ধু ঢুকে পড়লেন দোকানের ভিতরে। দোকানদার একজন হাসিখুশি মধ্যবয়সি মানুষ। জগবন্ধু হারমোনিয়ামের কথা বলতেই পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন তাঁকে। সেই ঘরে নানা ধরনের হারমোনিয়াম রাখা আছে।

BanglaBook.org

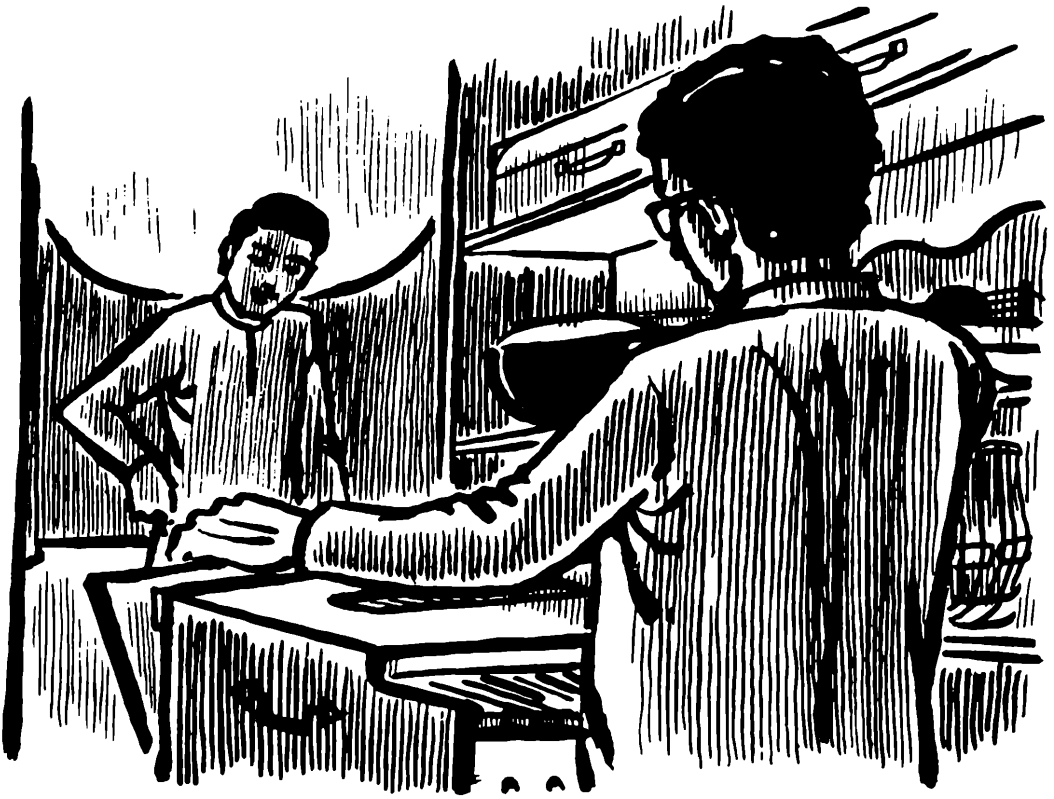

বেশ কয়েকটা হারমোনিয়াম দেখবার পর শেষে একটা পছন্দ হল জগবন্ধুর। সেটা কিন্তু অন্যগুলোর চেয়ে ছোটো আকারের। অনেকটা, বৈষ্ণবরা যে-হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে নামসংকীর্তন করে সেই ধরনের। জিনিসটা খুব হালকাও, বাক্সের ভিতর ভরা থাকলে অনায়াসে হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। দোকানদারকে জিনিসটার দাম মিটিয়ে দিয়ে পথে নেমে একটা ট্যাক্সি ধরলেন জগবন্ধু। তারপর শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরে, ঘণ্টা দুয়েক পরে যখন নিজের স্টেশনে নামলেন তখন বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে।

BanglaBook.org

স্টেশন থেকে জগবন্ধুর বাড়ি বেশ কিছুটা দূরে। হেঁটে যেতে মিনিট চল্লিশ সময় লাগে। হারমোনিয়ামটা হাতে ঝুলিয়ে যখন তিনি স্টেশনের বাইরে রিকশা স্ট্যান্ডে উপস্থিত হলেন তখন স্ট্যান্ডে একটাও রিকশা দেখতে পেলেন না। বোধ হয় তারাও আজ কোথাও খেলা দেখতে বসে গেছে। অগত্যা হারমোনিয়ামের বাক্সটা হাতে ঝুলিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা লাগালেন জগবন্ধু। বাড়ির সামনে যখন তিনি পৌঁছোলেন তখন সাতটা বাজতে চলেছে। সামনেই পুজো আসছে। বাতাসেও যেন তার একটা আমেজ। তাই

হারমোনিয়ামের বাক্সটা নিয়ে এতটা পথ হেঁটে আসলেও কোনো ক্লান্তি বোধ হল না জগবন্ধুর।

বাড়ির ঠিক সামনের ল্যাম্পপোস্টটার নীচে এসে প্রতিদিনের মতো একটু দাঁড়ালেন তিনি। তারপর পকেট থেকে চাবি বের করে বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন জগবন্ধু। বাড়িটা জগবন্ধুর ঠাকুরদার আমলের, ওপর-নীচ মিলিয়ে গোটা আষ্টেক ঘর। অনেকেই জগবন্ধুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, একলা এত বড়ো বাড়িতে না থেকে অন্তত নীচের তলাটায় একটা ভাড়াটে বসিয়ে দিতে। কিন্তু জগবন্ধুর মন সায় দেয়নি তাতে। একলা দিব্যি আছেন তিনি। কত টাকার বিনিময়ে ভাড়াটে বসিয়ে নিজের শান্তিভঙ্গ করতে তিনি মোটেই রাজি নন।

একলা থাকতে তাঁর কোনো অসুবিধাই হয় না। প্রতিদিন সকালে গোপালের মা এসে বাড়ি ঘরদোর পরিষ্কার করে রান্না করে দিয়ে যায়। রোজ সকাল ন-টার সময় অফিস যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরোবার আগে রাতের ভাত-ডাল-তরকারি ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে যান, ফলে রাতে ফিরে রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট আর পোহাতে হয় না জগবন্ধুকে।

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে এসে তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেন জগবন্ধু। কাল রবিবার, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে সপ্তাহের বাজারটা সেরে ফেলতে হবে। বিছানায় শোওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখে ঘুম নেমে এল।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জগবন্ধুর। তাঁর কেন জানি মনে হতে লাগল কোথা থেকে একটা হারমোনিয়ামের মিষ্টি সুর ভেসে আসছিল এতক্ষণ। ঘুম ভাঙার সঙ্গেসঙ্গেই সেটা হারিয়ে গেল। সেই সুরের রেশ কিন্তু এখনও জগবন্ধুর কানে বাজছে। বিছানা থেকে নেমে আলোটা জ্বালালেন তিনি। খাটের পাশে টেবিলের ওপর হারমোনিয়ামটা রাখা আছে। তার পাশে রাখা ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক গ্লাস জল খেলেন তিনি। তারপর আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন।

পরদিন ভোরে উঠে চোখমুখ ধুয়ে, চা খেয়ে হাতে বাজারের থলে নিয়ে বাজারের দিকে পা বাড়ালেন জগবন্ধু। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলেন তাঁর পাড়ার গোপীনাথবাবু বাজার করে ফিরছেন। গোপীনাথবাবুকে তিনি একটু এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। কারণ গোপীনাথবাবু একবার কথা বলতে শুরু করলে আর থামতে চান না। তা ছাড়া বৃদ্ধ গোপীনাথবাবুর সব কিছুতেই

BanglaBook.org

ব্যাপক কৌতূহল। আজ একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেলেন। জগবন্ধুকে দেখতে পেয়েই গোপীনাথ বললেন, 'কী হে জগবন্ধু, কাল রাতে দেখলাম তুমি একটা বাক্স নিয়ে বাড়ি ফিরলে, কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলে বুঝি?

জগবন্ধু উত্তর দিলেন, 'না কোথাও যাইনি। হাতে একটা হারমোনিয়ামের বাক্স ছিল।'

গোপীনাথ আবার প্রশ্ন করলেন, 'তা তোমার সঙ্গোর লোকটি কে ছিল? তাকে তো আগে কখনো দেখিনি।'

জগবন্ধু বললেন, 'কই, আমার সঙ্গো তো কেউ ছিল না।'

জগবন্ধুর কথা শুনে গোপীনাথ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কী হে! কাল স্পষ্ট দেখলুম—তুমি যখন বাক্স হাতে বাড়ি ফিরলে, তখন তোমার পেছন পেছন একজন লোক এল, তুমি যখন ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়ালে সেও তখন তোমার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর তুমি যখন দোর খুলে ভিতরে ঢুকলে, সেও তোমার সঙ্গো ভিতরে ঢুকে গেল। আর তুমি বলছ কিনা তোমার সঙ্গো কেউ ছিল না! দেখো জগবন্ধু, আমি বুড়ো হয়েছি ঠিকই, চোখে আমার চশমাও আছে, তা বলে এতটা ভুল দেখার মতন অবস্থা আমার এখনও হয়নি।'

এই বলে গজগজ করতে করতে বাড়ির পথ ধরলেন গোপীনাথবাবু। ওনার কথার কোনো মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে এরপর জগবন্ধুও এগোলেন বাজারের দিকে।

BanglaBook.org

দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে টেবিলের ওপর থেকে হারমোনিয়ামটা নিয়ে পাশের ঘরের তক্তপোশে গিয়ে বসলেন জগবন্ধু। হারমোনিয়ামটার বেশ বয়স হয়েছে বোঝা যায়। তার জায়গায় জায়গায় পালিশ উঠে গেছে। বহু ব্যবহারে ফলে রিডগুলো স্থানে স্থানে কিছুটা খয়েরি রঙের হয়ে গেছে। হারমোনিয়ামটা যে এত পুরোনো তা কাল দোকানের আলো-আঁধারের মধ্যে জগবন্ধু ঠিক বুঝতে পারেননি। তাই এখন হারমোনিয়ামটা দেখে কিছুটা মুষড়ে পড়লেন। ক্লিপ থেকে বেলোটা খুললেন তিনি। অমনি একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ এসে নাকে লাগল। তারপর রিডের ওপর হাত বোলাতেই যেন সুরের রামধনু খেলে গেল ঘরের ভিতর।

জগবন্ধু অবাক হয়ে গেলেন তাই শুনে। এত মিষ্টি শব্দ যে এর থেকে হতে পারে, তা ভাবতে পারেননি তিনি।

ছোটোবেলায় তাঁর মামাবাড়িতে একটা হারমোনিয়াম ছিল। একবার সেখানে মার সঙ্গে গিয়ে সা-রে-গা-মা-টা শিখেছিলেন তিনি। দু-একবার চেষ্টা করার পর তিনি দেখলেন সেটা এখনও ভোলেননি। সারা দুপুরটা মেতে রইলেন হারমোনিয়ামটা নিয়ে।

আস্তে আস্তে বিকাল হয়ে গেল। জগবন্ধুর আবার আজ একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ আছে নৈহাটিতে। তাই তিনি হারমোনিয়ামটা বন্ধ করে উঠে পড়লেন।

রাত দশটা নাগাদ নিমন্ত্রণ খেয়ে জগবন্ধু যখন রিকশা থেকে পাড়ার মোড়ে নামলেন, তখন দেখলেন সামনের একটা দোকানে বারোয়ারি পুজো কমিটির ছেলেগুলো আড্ডা মারছে। তাদের দেখে জগবন্ধুর মনে পড়ল আজ তাদের চাঁদার টাকাটা দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। টাকাটা দেওয়ার জন্য তিনি এগিয়ে গেলেন তাদের দিকে। চাঁদাটা দিয়ে তিনি যখন তাঁর বাড়ির দিকে এগোতে যাচ্ছেন, ছেলেদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'দাদা যে সংগীত সাধনা করেন, তা তো আমাদের জানা ছিল না। এবার আমাদের পূজামণ্ডপে আপনাকেও গাইতে হবে কিন্তু।'

জগবন্ধু ভাবলেন আজ দুপুর বেলা যখন তিনি হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছিলেন, তখন হয়তো তারা বাড়িতে গিয়েছিল। নীচ থেকে তাদের ডাক হয়তো তিনি শুনতে পাননি। এই ভেবে জগবন্ধু তাদের বললেন, 'ও, দুপুর বেলা তোমরা আমরা বাড়িতে গিয়েছিলে বুঝি? আসলে আমি তো ওপরের ঘরে বসে বাজাচ্ছিলাম, তাই তোমাদের ডাক শুনতে পাইনি।'

জগবন্ধুর কথা শুনে ছেলেটা বলল, 'না না, দুপুর বেলায় নয়, সন্ধ্যা নামার একটু পরেই আমরা আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম। ওই যখন লোডশেডিং হয়েছিল। শুনতে পেলাম আপনি দোতলার ঘরে বসে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন। আমরা বেশ কয়েকবার ডেকেছিলাম আপনাকে। আপনি বোধ হয় শুনতে পাননি। এমনিতেই লোডশেডিং, তার ওপর আপনি তো আর চাঁদা না দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার লোক নন, তাই আর আপনাকে ডাকাডাকি করিনি।'

BanglaBook.org

ছেলেটার কথা শুনে জগবন্ধুর মাথার ভিতরটা কেমন গুলিয়ে গেল। তিনি তো আজ বিকালের পর থেকে বাড়িতেই ছিলেন না, তাহলে তিনি সন্ধ্যার পর হারমোনিয়াম বাজালেন কীভাবে! মুখে কিছু না বলে বাড়ির দিকে পা চালালেন।

আগের দিনের মতন সেদিনও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল জগবন্ধুর। তাঁর যেন মনে হতে লাগল কোথা থেকে হারমোনিয়ামের শব্দ ভেসে আসছে। বিছানাতে শুয়ে শুয়ে তা শুনতে লাগলেন। সুরটা যেন তাঁর মনের মধ্যে কেমন একটা নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর জগবন্ধু বুঝতে পারলেন সুরটা ভেসে আসছে তাঁর পাশের ঘর থেকে। কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না। মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি হতে লাগল।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন জগবন্ধু। তারপর আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বারান্দাতে বেরিয়ে পাশের ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন তাঁর অনুমান সত্যি। হারমোনিয়ামের শব্দটা আসছে ঘরের ভিতর থেকেই। ঘরের দরজাটা খোলা। সামনে ভারী পরদা ঝুলছে। এ অঞ্চলে চোরের উপদ্রব নেই বলে সাধারণত দোতলার ঘরের জানলা-দরজা খোলাই থাকে। পরদার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতেই জগবন্ধু এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন। ঘরের ভিতর আলো জ্বালা না থাকলেও খোলা জানলা দিয়ে এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের ভিতর। সেই আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একজন বৃদ্ধ লোক তক্তপোশের ওপর বসে মাথা নীচু করে একমনে বাজিয়ে চলেছে হারমোনিয়ামটা। পরনে তার ধবধবে সাদা চুড়িদার-পাঞ্জাবি, আর মাথায় ছোট্ট একটা কাপড়ের তিনকোনা টুপি।

হঠাৎ লোকটা মুখ তুলে তাকাল দরজার দিকে, অমনি জগবন্ধুও সরে দাঁড়ালেন দরজার পাশ থেকে। কিন্তু সে মনে হয় দেখতে পেয়েছে জগবন্ধুকে, কারণ হারমোনিয়ামের শব্দটা সঙ্গেসঙ্গেই থেমে গেল।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন জগবন্ধু। তারপরই পরদা সরিয়ে আচমকা জ্বেলে দিলেন ঘরের আলোটা। বিদ্যুতের আলোতে ঝলমল করে উঠল সারা ঘর। কিন্তু সে-ঘরের মধ্যে কেউ কোথাও নেই! শুধু একটু হালকা

BanglaBook.org

আতরের গন্ধ ছড়িয়ে আছে ঘর জুড়ে। আর হারমোনিয়ামের বেলোটা খোলা অবস্থায় রয়েছে।

কিছুক্ষণ সেই ঘরে দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘরের আলো নিভিয়ে নিজের ঘরে শুতে চলে গেলেন জগবন্ধু। পরদিন ভোরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙল, রাতের ঘটনাটাকে নেহাতই স্বপ্ন বলে ধরে নিলেন তিনি।

দিন সাতেকের জন্য অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছিলেন জগবন্ধু। কিন্তু সেখান থেকে ফেরবার সময় এক বিপত্তি হল। ট্রেনের মধ্যে থেকে ব্রিফকেসটা খোয়া গেল জগবন্ধুর। টাকাপয়সা তাতে না থাকলেও কিছু জামাকাপড় আর বাড়ির চাবির গোছাটা ছিল তার মধ্যে। অতএব তালা না ভাঙলে বাড়িতে ঢোকা সম্ভব নয়। তাই বাড়িতে ঢোকবার সময় পাড়ার একটা ছেলেকে ডেকে নিয়ে এসে সদর দরজার, শোওয়ার ঘরের ও রান্নাঘরের তালাটা ভাঙলেন তিনি। অন্য ঘরগুলো বন্ধই রইল।

জগবন্ধু ভাবলেন ডুপ্লিকেট চাবিগুলো ঘরের কোথাও রাখা আছে কি না খুঁজে দেখবেন। সেগুলো যদি পেয়ে যান তাহলে আর তালাগুলো ভেঙে নষ্ট করতে হবে না। কিন্তু নানা কাজের চাপে চাবিগুলো আর খুঁজে বার করা হয়ে উঠল না। তা ছাড়া ঘরগুলোতে খুব বেশি প্রয়োজনীয় জিনিস না থাকায়, ঘরগুলো খোলার জন্যে খুব একটা তাগিদও অনুভব করলেন না। তাই ঘরগুলো বন্ধ অবস্থাতেই পড়ে রইল। হারমোনিয়ামের কথাটা প্রায় ভুলেই গেলেন।

একদিন গোপীনাথবাবু তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মাঝে মাঝে রাতের বেলাতে যে ভদ্রলোককে তোমার ছাদে দেখতে পাই, তিনি তোমার কে হন?'

অনিদ্রার রুগি, চোখে মোটা কাচের চশমা আঁটা, গোপীনাথবাবুর প্রশ্ন জগবন্ধুর কাছে অবান্তর মনে হওয়াতে তার কোনো উত্তর দেননি তিনি।

মাস দুয়েক কেটে গেছে। বেশ শীত পড়েছে এবার। দরজা-জানলা বন্ধ করে সেদিন রাতে লেপমুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলেন জগবন্ধু। অনেকদিন পর আবার হঠাৎই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল জগবন্ধুর। তাঁর

BanglaBook.org

কানে এসে বাজতে লাগল হারমোনিয়ামের সুর। তবে সেই সুর, সেই ধ্বনি কেমন যেন বিষাদ মাখা। লেপমুড়ি দিয়ে সেই শব্দ শুনতে লাগলেন জগবন্ধু। কিছুক্ষণ পর থেমে গেল সেই শব্দ। আর তারপরই জগবন্ধুর মনে হল তাঁর ঘরের মধ্যে কেউ যেন প্রবেশ করেছে। মুখের ওপর থেকে লেপটা সরিয়ে ফেললেন তিনি। অন্ধকার ঘরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু তার নিশ্বাস ফেলার শব্দ যেন স্পষ্টই শুনতে পেলেন। আরও অনুভব করলেন, একটা মিষ্টি আতরের গন্ধ যেন ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে।

জগবন্ধুর আজকে সত্যি ভয় ভয় করতে লাগল। হাত বাড়িয়ে জগবন্ধু খাটের পাশে রাখা টেবিলল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিতেই হালকা নীল আলোয় ভরে গেল সারা ঘর। জগবন্ধু দেখলেন তাঁর পায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই বৃদ্ধ লোকটা! যাকে তিনি একদিন পাশের ঘরে চাঁদের আলোতে হারমোনিয়াম বাজাতে দেখেছিলেন।

জগবন্ধুর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসতে লাগল। তিনি শুধু একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার দিকে। খাটে শুয়ে লোকটির মাথা থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। আজও তার পরনে একই পোশাক। শুধু সেদিনের থেকে আজ তাকে অনেক বেশি বৃদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। করুণ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রয়েছে জগবন্ধুর দিকে।

বৃদ্ধের ঠোঁট এবার নড়তে শুরু করল। জগবন্ধুর মনে হল তার কণ্ঠস্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। সে কী বলছে তা কানে শুনলেও মাথায় নিতে পারছিলেন না জগবন্ধু। কারণ আতঙ্কে তখন তাঁর বুদ্ধি লোপ পাওয়ার অবস্থা।

লোকটা কথা বলেই চলেছে।

কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর কিছুটা ধাতস্থ হলেন জগবন্ধু। তাঁর মনে হল লোকটা আর যাই করুক তাঁর কোনো ক্ষতি করবে না। তিনি এবার মন দিয়ে বৃদ্ধ কী বলছে তা শোনার চেষ্টা করলেন। ততক্ষণে বৃদ্ধের কথা বলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুধু শেষের দিকের কয়েকটা কথা কানে এসে বিঁধল তার, 'বাবুজি, হামার সারা জিন্দেগির কামাই উও হারমনির অন্দর রাখা আছে, লেকিন আজ হামার ঘরে বাচ্ছালোগ একটা রোটির জন্য ভিখ

BanglaBook.org

মাঙছে। উও হারমনি আপনি ওদের ওয়াপস করে দিন বাবুজি। নেহি তো সব ভুখা মরে যাবে।'

কথা শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল লোকটা। জগবন্ধুর মনে হল লোকটার চোখের কোলে যেন জল চিকচিক করছে। এরপর মাথায় হাত ছুঁয়ে জগবন্ধুকে কুর্নিশ করে অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে মিশে গেল লোকটা।

ভোর বেলাতেই একজন লোক ডেকে এনে পাশের ঘরের তালাটা ভেঙে ফেললেন জগবন্ধু। দু-তিন মাসের অব্যবহারের ফলে বেশ কিছুটা ধুলো জমেছে ঘরে। কিন্তু হারমোনিয়ামটা দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি।

BanglaBook.org

তার ওপর একটুও ধুলোর আস্তরণ নেই। কেউ যেন যত্ন করে মুছে রেখেছে সেটা।

হারমোনিয়ামটা নিজের ঘরে নিয়ে এলেন জগবন্ধু। তারপর দরজা-জানলা ভালো করে খুলে দিয়ে পরদা সরিয়ে দিলেন তিনি। সকালের আলোতে ঝলমল করে উঠল সারা ঘর। সেই আলোতে ভালো করে হারমোনিয়ামটা দেখতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল হারমোনিয়ামের গায়ে এক জায়গায় পালিশ চটে গিয়ে কয়েকটা সংখ্যা যেন ফুটে উঠেছে। একটা ন্যাকড়া জলে ভিজিয়ে এনে সেখানটাতে ভালো করে ঘষতেই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠল পরপর সাতটা সংখ্যা।

জগবন্ধু এবার আরও ভালো করে দেখে বুঝতে পারলেন হারমোনিয়ামের প্রত্যেকটা রিডই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা। কিন্তু তারা এতই ক্ষুদ্র যে সাধারণ অবস্থাতে তাদের বোঝাই যায় না। অনেক চেষ্টার পর সংখ্যাগুলোকে মোটামুটি উদ্ধার করতে পারলেন জগবন্ধু। তারপর হঠাৎ কী মনে হতে সেই সাতটা সংখ্যা মিলিয়ে পরপর রিড টিপতেই হারমোনিয়ামের নীচের দিকের একটা অংশ ফাঁকা হয়ে গেল। বেরিয়ে পড়ল একটা খোপ। জগবন্ধু তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বার করে আনলেন একটা ছোটো চামড়ার থলে। থলেটা টেবিলের ওপর উপুড় করতেই তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল অনেকগুলো ছোটো ছোটো ভাঁজ করা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কাগজের টুকরো।

একটা ছোটো কাগজের টুকরো হাতে তুলে নিলেন জগবন্ধু। দীর্ঘদিন থাকার কারণে কাগজের টুকরোগুলো একদম নষ্ট হতে বসেছে। অতি সাবধানে একটা টুকরোর ভাঁজ খুলে চমকে উঠলেন তিনি। আসলে সেগুলো হল ব্রিটিশ সরকারের আমলের ভাঁজ করা একশো টাকার নোট। জগবন্ধু গুনে দেখলেন মোট একশোটা আছে। অর্থাৎ সেই সময়কার দশ হাজার টাকা! কিন্তু আজকে এই নোটগুলো হয়তো-বা বাজে কাগজের মতনই মূল্যহীন।

কিছুক্ষণ সেগুলো নিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন জগবন্ধু। নোটগুলো যখন তিনি থলের মধ্যে ভরে রাখতে যাবেন, তখন তার মধ্যে আর-একটা জিনিস দেখতে পেলেন। জিনিসটা হল একটা ছোট্ট কাপড়ের পুঁটলি। তার

BanglaBook.org

ভেতর থেকে বের হল এক ছড়া মালা। হলদেটে হয়ে গেলেও মালাটা যে মুক্তোর তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না। মালায় একটা ছোট্ট লকেটও আছে। লকেটের পিছনে একটা নাম ইংরেজিতে খোদাই করা। 'আহম্মদ নাজাফি'। জগবন্ধুর মনে হল এই নামটা যেন তিনি কোথাও দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন। কিন্তু অনেক ভাবার পরও মনে করতে পারলেন না।

জগবন্ধু সেদিন ট্রেনে উঠে চুপচাপ জানলার পাশে বসেছিলেন। বারবারই খালি 'আহম্মদ নাজাফি' নামটা তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরে-ফিরে আসছে। পাশে বসে এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে পকেট ট্রানজিস্টারে খেলার রিলে শুনবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কিছুতেই সেন্টারটা ঠিকমতন ধরতে পারছিলেন না।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর লোকটা বিরক্ত হয়ে অন্য একটা সেন্টার ধরলেন। সেখানে গানের আসর হচ্ছে। জগবন্ধুও শুনতে শুনতে চললেন সেই গান। একটা গান শোনাবার পর ঘোষিকা বললেন, 'এবার আপনাদের একটা কাওয়ালি গান পরিবেশন করব।' 'কাওয়ালি' শব্দটা কানে আসবার সঙ্গেসঙ্গেই জগবন্ধু যেন লাফিয়ে উঠলেন। এবার তাঁর সব মনে পড়ে গেছে। কিছুদিন আগে তিনি এক দৈনিক সংবাদপত্রে কাওয়ালি গায়কদের নিয়ে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলেন। তাতেই লেখা ছিল বিখ্যাত কাওয়ালি গায়ক আহম্মদ নাজাফির সম্বন্ধে কিছু কথা।

শিয়ালদাতে ট্রেন থেকে নামবার পর জগবন্ধু ট্যাক্সি ধরে ছুটলেন সেই সংবাদপত্রের অফিসের দিকে। সেখান থেকে তিনি একটা ঠিকানা পেলেন।

ঠিকানার সূত্র ধরে দু-দিন অনেক ছোটাছুটির পর অবশেষে জগবন্ধু এসে উপস্থিত হলেন পার্ক সার্কাসের এক বস্তিতে। সেখানে আলম নাজাফি বলে একটা নাম খোঁজাখুঁজি করতেই একজন দেখিয়ে দিল একটা খাপরার চালওলা বাড়ি। সেই বাড়ির সামনে নোংরা মাটিতে বেশ কয়েকটা ছোটো ছোটো বাচ্চা ছেলে-মেয়ে খেলা করছে। জগবন্ধু সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন বছর তিরিশের যুবক কাশতে কাশতে বাইরে বেরিয়ে এল। জগবন্ধু তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন তার নামই আলম নাজাফি।

জগবন্ধু বেশ কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলার পর সে জগবন্ধুকে নিয়ে

BanglaBook.org

ঘরের ভেতরে গেল। ঘরের ভেতরে অভাবের চিহ্ন সুস্পষ্ট। ঘরের এক কোণে নোংরা বিছানার ওপর শুয়ে আছেন তার অন্ধ বৃদ্ধা মা। আর মেঝেতে খেলা করছে রোগা রোগা দুটো শিশু।

আলম জগবন্ধুকে এনে দাঁড় করাল একটা নোনাধরা দেওয়ালের সামনে। সেই দেওয়ালে টাঙানো আছে অনেকদিনের পুরোনো বিবর্ণ হয়ে যাওয়া একটা ছবি। ছবিটা হল আলম নাজাফির পিতামহের ছবি। ইনিই ছিলেন লক্ষ্ণৌ-এর বিখ্যাত কাওয়ালি গায়ক আহম্মদ নাজাফি।

ছবির মানুষটি মধ্যবয়সের হলেও তাঁকে চিনে নিতে অসুবিধা হল না জগবন্ধুর। এই লোক আর সেই মানুষটি একই ব্যক্তি, যিনি ক-দিন আগে এক রাতে এসে দেখা দিয়েছিলেন জগবন্ধুকে।

এরপর আলমকে সঙ্গো করে ঘরের বাইরে এলেন জগবন্ধু। আলমের মুখ থেকে শুনলেন এই বিখ্যাত গায়কের বংশধরদের বর্তমান করুণ অবস্থার কথা। ভাগ্যের পরিহাসে কীভাবে লক্ষ্ণৌ-এর হাভেলির পরিবর্তে আজ তাদের ঠিকানা হয়েছে পার্ক সার্কাসের এই বস্তি। এখানেই ছোটো ছোটো শিশু ও বৃদ্ধা অন্ধ মাকে নিয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে আলম। ঘটি-বাটি যা ছিল, সব বিক্রি হয়ে গেছে। এমনকী আহম্মদ নাজাফির শেষ স্মৃতি হারমোনিয়ামটাও, কয়েক মাস আগে ছেলের অসুখের কারণে মাত্র দুশো টাকায় নিউমার্কেটের এক দোকানে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে সে। এসব কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল আলম।

পরদিন আলমকে সঙ্গো করে বউবাজারের এক পরিচিত সোনার দোকানে গেলেন জগবন্ধু। মালাটা সেখানে বিক্রি করে পেলেন তিরিশ হাজার টাকা। সম্পূর্ণটাই তিনি তুলে দিলেন আলমের হাতে। আর পুরোনো নোটগুলো একটা কিউরিও শপে বিক্রি করে পাওয়া গেল হাজার কুড়ি টাকা। সেই টাকাটা তিনি আলমের ছেলে-মেয়েদের জন্য ব্যাঙ্কে জমা করে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে জগবন্ধু আলমের জন্য নিজের অফিসে একটা ছোটোখাটো কাজেরও ব্যবস্থাও করে ফেললেন।

আলম যেদিন তার অফিসে কাজে যোগদান করল, সেদিন প্রচণ্ড খুশিমনে বাড়ি ফিরলেন জগবন্ধু। তারপর তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মাঝরাতে সেদিনও আবার হারমোনিয়ামের শব্দে জেগে

BanglaBook.org

উঠলেন তিনি। তার মনে হতে লাগল ঘরের মধ্যে যেন এক অদ্ভুত সুর ছড়িয়ে পড়ছে। সে সুর বিষাদের নয়, সে যেন দ্রুত ছন্দের সুরের রামধনু। জগবন্ধু ভেসে যেতে লাগলেন সেই সুরের প্লাবনে। অবশেষে একসময় বন্ধ হল সেই সুর, আর সঙ্গেসঙ্গেই মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠল ঘর। জগবন্ধু বুঝতে পারলেন আজ আবার তিনি এসেছেন। আজ আর তাঁর ভয় করছে না। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলেন তিনি। দেখলেন সেদিনের মতো আজও তাঁর ঘরের ভিতর এসে দাঁড়িয়েছেন সেই মানুষটি। আজও তাঁর চোখে জল, কিন্তু সে জল দুঃখের নয়, আনন্দের। খুশিতে যেন ঝলমল করছে তার মুখ। জগবন্ধুর দিকে চেয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে একবার কুর্নিশ করলেন তিনি, তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলেন।

পরদিন জগবন্ধু আলমের বাড়ি গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন হারমোনিয়ামটা।

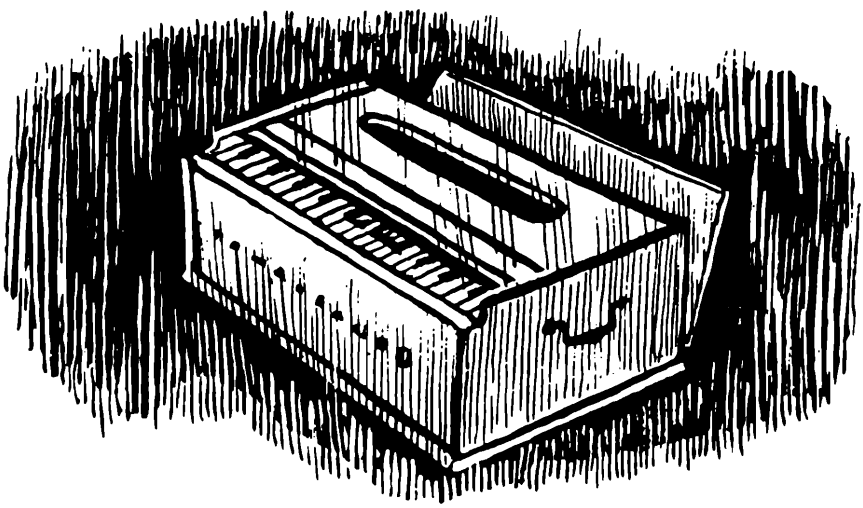

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ধূর্জটিবাবুর প্ল্যানচেট

পলাশ বলল, 'কিরে নিলু, পর পর চারটে ট্রেন চলে গেল। অনির্বাণ তো এখনও এল না? এদিকে তোর ধূর্জটিবাবুরও কোনো পাত্তা নেই! তিনি আবার বাঘমুণ্ডি পাহাড়ে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসতে চলে গেলেন না তো?'

নিলু বলল, 'দেখ পলাশ, সিদ্ধপুরুষদের নিয়ে মজা করবি না। বাঘমুণ্ডি নয়, উনি অমাবস্যা রাতে তারাপীঠের মহাশ্মশানে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে শবসাধনা করেছিলেন। উনি যখন কথা দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই আমাদের নিতে আসবেন। তুই মোবাইলে আর এক বার ট্রাই কর অনিবার্ণকে। ও আবার ঘাবড়ে গেল না তো? শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে বসে প্ল্যানচেট-ভূত-প্রেত নিয়ে মজা করা, আর এখানে এসে সত্যিকারের প্রেতসিদ্ধ জ্যোতিষীর মুখোমুখি প্ল্যানচেটে বসা, এ দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাত!'

নিলুর খোঁচাটা বুঝতে অসুবিধে হল না পলাশের। ও বলল, 'ঝড়বৃষ্টির মধ্যে হয়তো কোথাও আটকে গিয়েছে। ওর কথার দাম আছে। আর ও যে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসি ছেলে, তা তো তুই জানিস।' এই বলে সে পকেট থেকে মোবাইল বের করে বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচার জন্য প্ল্যাটফর্মের শেডের আর একটু ভিতরে এসে দাঁড়াল। অনির্বাণকে রিং করার চেষ্টা করে কানে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত পর সেটা আবার কান থেকে নামিয়ে নিল পলাশ।

নিলু প্রশ্ন করল, 'কী হল?'

পলাশ জবাব দিল, 'নেটওয়ার্ক ফেলিওর এখনও। যা ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে কখন নেটওয়ার্ক পাওয়া যাবে কে জানে?'

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই কড়াৎ কড়াৎ শব্দে কাছেই কোথাও যেন বাজ পড়ল। সারা প্ল্যাটফর্ম কেঁপে উঠল সেই শব্দে। আর কিছুক্ষণ পরই সন্ধ্যে নামবে। বৃষ্টিরও বিরাম নেই। ঝাপসা হয়ে যাওয়া

BanglaBook.org

বাইরের দিকে তাকিয়ে পলাশ বলল, 'ধূর্জটিবাবুর বাড়ি এখান থেকে কত দূর?'

নিলু জবাব দিল, 'গাড়িতে আধ ঘণ্টার পথ। উনি গাড়ি নিয়ে আসবেন বলেছেন।' এরপর সে বলল, 'অনির্বাণ না এলে প্রেস্টিজ পাংচর হয়ে যাবে আমার। আসলে উত্তেজনার বশে তোদের কথাটা ওঁকে বলা আমার উচিত হয়নি। ব্যাপারটা উনিও সিরিয়াসলি নিয়েছেন। এখন তো আমাদের ফিরে যাওয়ারও উপায় নেই। ওঁর বাড়িতে রাতে খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন উনি। এখানে এসে ফিরে যাওয়া মানে ওঁকে অসম্মান করা। তা ছাড়া উনি বড়োমামার বন্ধুমানুষ। বড়োমামা শুনলেও রাগ করবেন।'

পলাশ তার কথার জবাবে কিছু বলল না। একটু দূরে প্ল্যাটফর্মের মধ্যে একটা চায়ের দোকান দেখিয়ে বলল, 'চল, ওখানে একটু চা খাই। বেশ ঠান্ডা লাগছে।'

ওরা দু-জন এর পর গিয়ে হাজির হল চায়ের দোকানের সামনে। দোকানদারকে চা দিতে বলে পলাশ বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, অনির্বাণ এল না কেন? কলকাতা থেকে বৃষ্টির দিনে তাদের এই নবাবগঞ্জে আসা বলতে গেলে তো তার জন্যই!

পলাশদের নবাবগঞ্জে আসার কারণটা একটু খুলে বলা যাক। পলাশ, নীলকান্ত অর্থাৎ নিলু, অনির্বাণ, এরা সকলেই শ্যামবাজারের বাসিন্দা এবং কাছেই গণেন্দ্র মিত্র লেনের 'যুগের পথিক' ক্লাবের সদস্য। প্রত্যেকেই ওরা কলেজ ছাত্র অথবা সদ্য পাশ করে বেরিয়েছে কলেজ থেকে। শরীরচর্চা, খেলাধুলো, লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত তাদের আড্ডার আসর বসে গণেন্দ্র মিত্র লেনের ঘুপচি ক্লাবঘরে। দিন দশেক আগে এমনই এক বর্ষার সন্ধেয় ক্লাবঘরে বসে গল্প করছিল তারা। শুধু তিন জন নয়, ঋজু, অসীম, তপন, ভোলা, আরও অনেকে সেদিন হাজির ছিল সেখানে। এসব আড্ডা যেমন হয়, এক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হতে হতে অন্য প্রসঙ্গ চলে আসে, ঠিক তেমনই কী একটা কথা আলোচনা করতে করতে হঠাৎ কে যেন তুলে বসল আত্মা নিয়ে কথা। শুরু হল আত্মা-প্রেতাত্মা আছে কি না তাই নিয়ে সনাতনী তর্ক।

নিলুর আত্মা-টাত্মার ব্যাপারে প্রচণ্ড বিশ্বাস। সে হঠাৎ বলল, 'আমার

BanglaBook.org

বড়োমামার বন্ধু জ্যোতিষী ধূর্জটি চক্রবর্তী, যাঁর কাছে আমি হাত দেখাই, তিনি প্ল্যানচেটে আত্মা নামাতে পারেন। আমার বড়োমামা এ ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন।'

অনির্বাণ প্রেসিডেন্সির ফিজিক্সের ছাত্র, ঘোর যুক্তিবাদী। নিলুর কথাটা শোনার সঙ্গেসঙ্গেই সে চেপে ধরল তাকে। বলল, 'যখন সুনীতা উইলিয়াম মহাশূন্যে পায়চারি করে এলেন, সে সময় দাঁড়িয়ে কেউ আত্মা নামাচ্ছেন, এ কথা বিশ্বাস করতে হবে? আসলে এসব ব্যাপার হল ধান্দাবাজ লোকদের লোক ঠকিয়ে পয়সা কামানোর কৌশল।'

ব্যস, শুরু হয়ে গেল জোর তর্ক। যারা হাজির ছিল, তারা ভাগ হয়ে গেল প্ল্যানচেটের মাধ্যমে আত্মা নামানো যায় কি না এই নিয়ে। পলাশেরও আত্মা-টাত্মায় বিশ্বাস নেই। স্বাভাবিক ভাবে সেও সেদিন অনির্বাণের পক্ষ নিয়েছিল। অনেক যুক্তি, পালটা যুক্তির পরও যখন সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো গেল না, তখন ভোলা একটা প্রস্তাব দিল। সে বলল, 'নিলু গিয়ে ধূর্জটিবাবুকে রাজি করাক প্ল্যানচেটে আত্মা নামিয়ে দেখানোর জন্য। তিনি যদি সত্যিই তা পারেন, তাহলে সকলেই ব্যাপারটা মেনে নেব। তবে এর মধ্যে একটা কন্ডিশন আছে। প্ল্যানচেটে মিডিয়াম অর্থাৎ যার মাধ্যমে আত্মা নামানো হয়, সেই মিডিয়াম করতে হবে অনির্বাণকে। তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে আত্মা নামানোর ব্যাপারটা সাজানো কি না!'

সেদিনের এই আলোচনা অন্য দিনের মতো শুধু আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। অনির্বাণ আর নিলু দুজনেই সিরিয়াসলি নিয়েছিল বিষয়টা। পরদিনই নিলু তার বড়োমামাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিল ধূর্জটিবাবুর বউবাজারের চেম্বারে। সব কথা শোনার পর প্ল্যানচেটের ব্যাপারে রাজি হয়ে গেলেন ধূর্জটিবাবু। তবে তিনি বললেন, নিলু, অনির্বাণ ও আর-একজন অর্থাৎ মোট তিন জনকে আজ এই আষাঢ় মাসের অমাবস্যার দিন তাঁর নবাবগঞ্জের বাড়িতে আসতে হবে। তাঁর বাড়িতে অন্য কেউ থাকে না। ফলে উভয় পক্ষের কোনো অসুবিধে হবে না। সেখানে রাত্রিবাস করে পরদিন কলকাতা ফিরতে পারবে নিলুরা। তাঁর আমন্ত্রণেই পলাশ আর নিলু বিকেলের ট্রেনে নবাবগঞ্জ প্ল্যাটফর্মে এসে নামল। কিন্তু কলকাতায় একটা কাজ সেরে অন্য ট্রেনে অনির্বাণের এখানে আসার কথা থাকলেও তার দেখা

BanglaBook.org

নেই। বৃষ্টির মধ্যে প্ল্যাটফর্মে অনির্বাণের জন্য এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে পলাশরা। ধূর্জটিবাবুও তাদের এখনও নিতে আসেননি।

চা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর পলাশ এক বার তার রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ছ-টা তো বাজল। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে যদি দু-জনের কেউ না আসেন, তাহলে ডাউন ট্রেন ধরে ব্যাক করব। আমরা দু-জন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। আমাদের কেউ দোষ দিতে পারবে না।'

পলাশের কথা শুনে একটু চিন্তা করে নিলু বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে তাই হবে!'

কথাটা বলল বটে, কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা কালো রঙের অ্যাম্বাসাডর গাড়ি এসে প্ল্যাটফর্মের বাইরে রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল।

গাড়িটা দেখেই নিলু বলে উঠল, 'ওই যে, ধূর্জটিবাবু এসে গিয়েছেন। ওটা ওঁর গাড়ি, আমি চিনি।'

গাড়ি থেকে বৃষ্টির মধ্যে বাইরে নেমে ছাতা খুললেন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা এক লম্বা চওড়া ভদ্রলোক। তিনি উঠে এলেন প্ল্যাটফর্মে। তাঁকে দেখে প্রথমে নিলু আর তার পিছন পিছন পলাশ এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন শেডের নীচে। নিলুরাও এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে।

BanglaBook.org

ভদ্রলোকের বয়স মনে হয় ষাটের কাছাকাছি হবে। ফরসা রং, টিকোলো নাক, দু-হাতে অনেক আংটি। পলাশ আর নিলুকে এক-বার ভালো করে দেখে নিয়ে তিনি নিলুর উদ্দেশে বললেন, 'আমি কলকাতা থেকে ফিরছি, তাই আসতে দেরি হয়ে গেল। তা তোমরা দু-জন কেন? আমি তো তিন জনকে আসতে বলেছিলাম। আর এই কি সেই ছেলে, যে মিডিয়াম হতে চায়?' গম্ভীর স্বরে এই কথাগুলো বলে ধূর্জটিবাবু তাকালেন পলাশের দিকে।

নিলু বলল, 'না না, এ সে নয়। এর নাম পলাশ। আমরা দু-জন একসঙ্গে এসেছি। অন্য ট্রেনে এসে এখানে আমাদের সঙ্গে মিট করার কথা অনির্বাণের। কিন্তু এক ঘণ্টা ধরে ওর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। ও এখনও এল না। মোবাইল কানেকশনও কাজ করছে না।'

তার কথা শুনে ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা দু-জনই বরং আমার সঙ্গে চলো। আমি হিউম্যান সাইকোলজি বুঝি। সম্ভবত সে ভয় পেয়েছে। সে আসবে না। মেঘ যত গর্জায় তত বর্ষায় না। সন্ধ্যে নেমে আসছে। জল-কাদায় বেশ কিছুটা পথ যেতে হবে আমাদের। তার উপর আমার গাড়ির একটা হেডলাইট আবার ভেঙে গিয়েছে আজ।' এই বলে তিনি তাকিয়ে রইলেন নিলুদের দিকে।

নিলু বলতে যাচ্ছিল, 'কিন্তু অনির্বাণ যদি পরের ট্রেনে এখানে এসে পৌঁছোয় তখন কী হবে?' কিন্তু তার আগেই প্ল্যাটফর্মের মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, 'বিশেষ ঘোষণা! ঝড়বৃষ্টিতে কুতুবপুর স্টেশনে গাছ পড়ে ওভারহেড তার ছিঁড়ে যাওয়ায় আপ লাইনে রাত দশটা পর্যন্ত কোনো ট্রেন চলবে না। যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে এই সংবাদ জানানো হচ্ছে।'

ঘোষণাটা শুনে ধূর্জটিবাবু বললেন, 'এর পর তার আসার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। আর যদি সে কোনোভাবে এখানে এসে হাজির হয়, আর যদি তার আমার বাড়ি যাওয়ার সত্যি ইচ্ছে হয়, তাহলে যেকোনো ভ্যানরিকশাকে বললেই সে আমার বাড়ি নিয়ে যাবে।' এ কথাগুলো বলে তিনি পলাশদের উত্তরের অপেক্ষা না করে, 'এসো', বলে হাঁটতে শুরু করলেন তাঁর গাড়িতে যাওয়ার জন্য।

পলাশ আর নিলু একবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অগত্যা

BanglaBook.org

ধূর্জটিবাবুকে অনুসরণ করল। গাড়িতে উঠে ধূর্জটিবাবু চালকের আসনে বসলেন। পলাশরা বসল তাঁর পিছনের আসনে। গাড়িতে ওঠার সময় প্রায় ভিজে গেল পলাশরা। গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার প্রায় সঙ্গোসঙ্গোই যেন ঝুপ করে অন্ধকার নামল বাইরে। একটা হেডলাইটের আলোয় খানাখন্দে ভরা মেঠোপথ দিয়ে বর্ষার অন্ধকারে ধূর্জটিবাবুর গাড়ি ছুটল তাঁর বাড়ির দিকে।

মিনিট কুড়ি পর ধূর্জটিবাবুর বাড়ির সামনে এসে পৌঁছোল পলাশরা। একটা মাঠের ঠিক মাঝখানে একলা ভূতের মতো দাড়িয়ে আছে পুরোনো ধাঁচের দোতলা বাড়িটা। কোনো আলো আসছে না বাড়ির ভিতর থেকে। গাড়িতে একটিও কথা বলেননি ধূর্জটিবাবু। পলাশের মনে হল, হয় তিনি গভীরভাবে কিছু ভাবছেন, নয় স্বভাবজাতভাবেই তিনি গম্ভীর মানুষ। গাড়ি থেকে নামার সময় তিনি শুধু বললেন, 'এখানে এখনও ইলেকট্রিসিটি নেই। তবে একটা রাত, তোমাদের আশা করি তেমন অসুবিধে হবে না।'

পলাশরা গাড়ি থেকে নামতেই ঘাসজমিতে জমে থাকা জলে তাদের পায়ের পাতা ডুবে গেল। বৃষ্টি একটু ধরেছে ঠিকই, তবে বাতাস এখনও বইছে। মাঠের চারপাশ থেকে ভেসে আসছে ব্যাঙের ডাক। জলের মধ্যে ছপ ছপ শব্দে পা ফেলে পলাশরা তাঁর পিছন পিছন উঠে এল বাড়ির বারান্দায়। পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ছোটো টর্চ বের করে সেটা জ্বালিয়ে চাবি দিয়ে একটা ঘরের দরজা খুললেন তিনি। তারপর ঘরের ভিতর ঢুকে একটা লন্ঠন জ্বালিয়ে তাদের দু-জনকে সে ঘরে বসতে বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ঘরটা পুরোনো হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটা পুরোনো আমলের পালঙ্ক আছে ঘরটায়। বিছানার উপর বসে নিলু বলল, 'সম্ভবত এই ঘরেই আমাদের আজ রাত কাটাতে হবে।'

পলাশ কোনো জবাব দিল না। সে ভাবতে লাগল, অনির্বাণ এল না কেন? সত্যি কি সে ভয় পেয়ে গেল?

মিনিট তিনেকের মধ্যেই একটা পাথরের থালায় মিষ্টি আর জল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ধূর্জটিবাবু। থালা আর জলের গ্লাস পালঙ্কের পাশে একটা টেবিলের উপর রাখলেন। 'তোমরা এগুলো খেয়ে নাও। আমি ততক্ষণ সান্ধ্য-আহ্নিক সেরে আসি।' এই বলে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

পাথরের থালায় বেশ বড়ো বড়ো অনেক মিষ্টি। সেই দুপুর বেলা খেয়ে বেরিয়েছে পলাশরা। মিষ্টিগুলো দেখে তাদের খিদে পেয়ে গেল। তারা খেতে শুরু করল।

সান্ধ্য-আহ্নিক সেরে যখন ধূর্জটিবাবু আবার পলাশদের ঘরে এলেন, তখন তাদের খাওয়া শেষ। তিনি পলাশদের বললেন, 'চলো, এবার অন্য ঘরে গিয়ে বসে কথা বলি।'

সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সবাই গিয়ে হাজির হল বাড়ির এক প্রান্তে, একটা ঘরে। সেই ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা কাঠের তেপায়া টেবিলের উপর একটা ছোটো মোমবাতি জ্বলছে। আর সেই টেবিলের চারদিকে সাজানো আছে চারটে কাঠের চেয়ার। এ ছাড়া অন্য কোনো আসবাব নেই সেই ঘরে। ঘরটায় আরও একটা দরজা আছে। ঘরে ঢুকে সেই দরজাটাও খুলে দিলেন ধূর্জটিবাবু। বাড়ির পিছন দিকের মাঠ থেকে একঝলক ভেজা বাতাস এসে ঢুকল ঘরের ভিতর। টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসলেন ধূর্জটিবাবু। তাঁর কথামতো সেখানে অন্য দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসল পলাশ আর নিলু। চেয়ারে বসার পর এক বার তাদের দিকে ভালো করে দেখলেন ধূর্জটিবাবু। পলাশের মনে হল তিনি যেন তাদের জরিপ করে নিলেন। ফাঁকা চেয়ারটা দেখিয়ে গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, 'একটা চেয়ার তোমাদের সেই বন্ধুর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সে তো এলই না। চার জন না হলে প্ল্যানচেটে বসা যাবে না। আমি ভেবেছিলাম তোমাদের কথার দাম আছে। তাই তোমাদের এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এখন বুঝলাম ।'

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্য নিলু বলল, 'প্ল্যানচেটে বসা না গেলেও আপনার মতো সিদ্ধপুরুষের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু জানার আছে। আচ্ছা, পঞ্চমুণ্ডির আসনে কীভাবে শবসাধনা করা হয় তা একটু শোনাবেন? আমার খুব জানার ইচ্ছে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর গম্ভীর কণ্ঠে ধূর্জটিবাবু বললেন, 'তাহলে এসব কথাই বলি শোনো। তোমরা যে সাধনার কথা শুনতে চাইলে, তা অতি কঠিন সাধনা। লাখে একজন তন্ত্রসাধকের এই সাহস হয়। অনেকের মৃত্যুও হয়েছে এই সাধনা করতে গিয়ে। প্রথমে সংগ্রহ করে আনতে হয় কোনো লাশ। মহাশ্মশানে অমাবস্যার রাতে সেই লাশের উপর পঞ্চমুণ্ডির

BanglaBook.org

আসন পেতে বসতে হয়। সঙ্গে রাখতে হয় মাটির ভাঁড়ে চালভাজা আর নরকরোটিতে সুরা। মন্ত্রোচ্চারণে প্রেতাত্মা এসে প্রবেশ করে সেই শরীরে। জীবন্ত হয়ে ওঠে লাশ। বীভৎস চিৎকার করে মাঝে মাঝে সে বলে ওঠে, 'দে, দে, আমার বড়ো খিদে পেয়েছে।' তখন একমুঠো চালভাজা আর সুরা তার মুখে ঢেলে দিয়ে শান্ত করতে হয় তাকে। এ সময় কেউ ভয় পেয়ে গেলে তার নির্ঘাত মৃত্যু! লাশের উপর পাতা আসনে শক্ত হয়ে বসে চামুণ্ডা মন্ত্র জপ করতে হয়। সে মন্ত্রও অত্যন্ত কঠিন। মন্ত্রের জোরে বশে থাকে প্রেতাত্মা। মন্ত্রে সামান্য ভুলচুক হলে যে বুকের উপর বসে আছে, তাকে ছিটকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াবে সেই লাশ। তারপর .।' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেলেন ধূর্জটিবাবু।

পলাশরা ডুবে গিয়েছিল তাঁর গল্পের মধ্যে। তিনি থামতেই নিলু উত্তেজনা চাপতে না পেরে বলে উঠল, 'তারপর? তারপর?'

তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে পিছন দিকের খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাইরে থেকে একটা শব্দ আসছে না?'

তাঁর কথা শুনে কান খাড়া করল পলাশরা। হ্যাঁ, একটা শব্দ। দরজা দিয়ে বাইরে অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে, কে যেন মাঠের জমা জলে ছপ ছপ শব্দে পা ফেলে বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে। ক্রমশই শব্দটা এগিয়ে আসতে লাগল। বলতে গেলে সে যেন আসছে পলাশরা যে ঘরে বসে আছে সেই ঘর লক্ষ করেই। সকলেই তাকিয়ে রইলেন দরজার দিকে। দরজার একদম কাছে এসে থেমে গেল শব্দটা। কয়েক মুহূর্ত কোনো সাড়াশব্দ নেই। তার পরই দরজার বাইরে অন্ধকার থেকে ফুটে উঠল একটা মানুষের অবয়ব। ঘরের ভিতর উঁকি মারল একটা মাথা। তা দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধূর্জটিবাবু বলে উঠলেন, 'কে! কে তুমি?'

আর তার পরেই আগন্তুককে চিনতে পেরে নিলু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উল্লাসে ধূর্জটিবাবুর উদ্দেশে বলল, 'ও হল আমাদের সেই বন্ধু, যার আসার কথা ছিল!'

ধূর্জটিবাবু যেন একটু অবাক হয়ে গেলেন। অবশ্য পলাশ আর নিলুও অবাক হয়ে গিয়েছে। সে যে এভাবে এখন হাজির হবে, তারা কেউ আশা করেনি। ধূর্জটিবাবু বললেন, 'এসো, ভিতরে এসো।'

BanglaBook.org

ঘরের ভিতর পা রাখল অনির্বাণ। সে একদম কাকভেজা। জল চুঁইয়ে পড়ছে মাথা থেকে। ঘরে ঢুকে একটু হেসে সে বলল, 'আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। অনেক কষ্ট করে আসতে হল তো!'

পলাশ বলল, 'আমরা তো ভেবেছিলাম তুই আর এলিই না। অনেকক্ষণ আমরা প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করেছি তোর জন্য।'

অনির্বাণ পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে মাথা মুছতে মুছতে বলল, 'আমি যখন আসব বলেছি, তখন আসবই। তাই তো এত কষ্ট করেও . . .।'

ধূর্জটিবাবু এবার বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন? চেয়ারে বোসো!'

মাথা মুছে অনির্বাণ এসে বসল পলাশের পাশের চেয়ারটায়। এত ভিজেছে যে, মোমের আলোয় তার মুখ যেন রক্তশূন্য বলে মনে হচ্ছে। সে বসার পর ধূর্জটিবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমিই কি মিডিয়াম হতে চেয়েছিলে? তোমার নাম কী?'

অনির্বাণ প্রথমে ঘাড় নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।' তারপর বলল, 'আমার নাম তাতাই।'

অনির্বাণ হঠাৎ তার ডাকনামটা বলল কেন, তা বুঝতে পারল না পলাশ। তার নাম শোনার পর ধূর্জটিবাবু বললেন, 'তুমি কি জানো, যে মিডিয়াম হয়, অনেক সময় কোনো শয়তান আত্মা মিডিয়ামকে ছেড়ে যাওয়ার সময় তার ক্ষতি করে দিয়ে যায়?'

অনির্বাণ তাঁর কথার উত্তরে বলল, 'ক্ষতি করে মানুষেরা, আত্মা নয়। কোনো আত্মা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

ধূর্জটিবাবুর দিকে তাকিয়ে একটু যেন রুক্ষ স্বরেই কথাগুলো বলল অনির্বাণ।

তার কথা শুনে ধূর্জটিবাবু কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'বাঃ, তোমার সাহস আছে দেখছি! তবে বেশি সাহস ভালো নয়!'

অনির্বাণ তাঁর কথার কোনো জবাব দিল না।

ধূর্জটিবাবু এর পর নিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের বন্ধু যখন এসেই পড়েছে, তখন আর পঞ্চমুণ্ডির আসনের গল্প বলে সময় নষ্ট করে

BanglaBook.org

লাভ নেই। তোমাদের অবিশ্বাসী বন্ধু নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে প্ল্যানচেটে বসার জন্য। বৃষ্টির মধ্যে এতটা পথ ভিজে এসেছে মিডিয়াম হবে বলে!' এই বলে তিনি যেন মৃদু কটাক্ষ করলেন অনির্বাণকে।

অনির্বাণ তাঁর কথা শুনে বলল, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে।'

এ কথা শুনে পলাশ বলল, 'সে কী রে? তুই আবার এই বৃষ্টিতে ফিরে যাবি?'

অনির্বাণ একটু বিষণ্ণভাবে পলাশকে বলল, 'না রে, আমার এখানে রাতে থাকা হবে না! অনেক লোকজন এসেছে বাড়িতে। আমাকে ফিরতেই হবে!'

ধূর্জটিবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে বরং শুরু করা যাক। দরজা দুটো বন্ধ করে দিতে হবে এবার! তবে প্ল্যানচেটে বসার আগে একটা কথা তোমাদের বলে দিই। কারও হার্ট দুর্বল থাকলে কিন্তু প্ল্যানচেটে না বসাই ভালো। দুর্ঘটনা ঘটলে আমাকে কিন্তু কেউ দোষ দিয়ো না!'

তাঁর কথা শেষ হতেই অনির্বাণ একটা বাঁকা হাসি হেসে বলল, 'আমাদের সকলেই হার্ট ঠিক আছে। আপনার হার্ট ঠিক আছে তো? আপনি নিজে ভয় পাচ্ছেন না তো?'

তার কথা শোনামাত্রই হঠাৎ যেন দপ করে জ্বলে উঠল ধূর্জটিবাবুর চোখ দুটো। তিনি কী যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করে নিলেন। মৃদু হেসে শুধু তিনি বললেন, 'যে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে শবসাধনা করে, সে কোনো প্রেতাত্মাকে ভয় পায় না।'

নিলু উঠে গিয়ে দরজা দুটো বন্ধ করে এল। টেবিলের একদম কাছে চেয়ারগুলো আরও এগিয়ে নিয়ে বসল সকলেই। মোমটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তার মৃদু আলোয় চেয়ারে বসে থাকা পলাশদের ছায়াগুলো কাঁপছে। চারপাশে কোনো শব্দ নেই। সকলে ঠিকভাবে বসার পর কয়েক মুহূর্ত অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে ধূর্জটিবাবু বললেন, 'তোমরা আমার মতো এইভাবে দু-হাতের আঙুলগুলোকে টেবিলের উপর আলতো করে ছুঁইয়ে রাখো। আমি আলো নেভাবার পর কেউ কোনো কথা বলবে না। শুধু একমনে চিন্তা করবে পরিচিত কোনো মৃত ব্যক্তির কথা।'

BanglaBook.org

পলাশরা তাঁর দেখাদেখি টেবিলের উপর আঙুল রাখল। আঙুল রাখতে গিয়ে পলাশের আঙুল মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে গেল তার পাশে বসা অনির্বাণের হাতের পাতা। পলাশের মনে হল, বৃষ্টিতে ভিজে অনির্বাণের হাত যেন বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে!

ধূর্জটিবাবু সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে এক ফুঁয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলেন। সারা ঘরে নেমে এল জমাটবাঁধা অন্ধকার। সকলেই এক মনে চিন্তা করতে লাগল পরিচিত কোনো মৃত মানুষের কথা।

নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘর। মিনিট পাঁচেক পর পলাশের মনে হল, টেবিলটা যেন থরথর করে একবার কেঁপে উঠল। আর তারপরই শোনা গেল ধূর্জটিবাবুর গম্ভীর অথচ চাপা কণ্ঠস্বর, 'আপনি কি এসেছেন? এসে থাকলে টেবিলে একবার শব্দ করুন।'

টেবিলটা আরও একবার কেঁপে উঠল। তারপর একটা পায়ায় শব্দ শোনা গেল, ঠক!

পলাশের একটু ভয় করল এবার। ধূর্জটিবাবুর গলা শোনা গেল, 'তাহলে আপনি এসেছেন! আপনার নাম কী?'

BanglaBook.org

পলাশের পাশে বসে থাকা অনির্বাণের গলায় প্রথমে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হল, তারপর একটা অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল, 'আমার . . . নাম . . অ .।'

নামটা স্পষ্ট শোনা গেল না শেষ পর্যন্ত। 'আপনার ঠিকানা কী?' এর পর প্রশ্ন করলেন ধূর্জটিবাবু।

আবার সেই ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেল অনির্বাণের গলা থেকে। তারপর একটা ভাঙা ভাঙা স্বরে সে ধীরে ধীরে বলল, 'সাতাত্তর, গণেন্দ্র মিত্র লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা ।'

ঠিকানাটা শুনেই প্রথমে একটু চমকে উঠল পলাশ। আরে, এ তো তাদের দুটো বাড়ি পরেই অনির্বাণের বাড়ির ঠিকানা! 'অ' তা হলে অনির্বাণ। অনির্বাণ তা হলে কায়দা করেই তার ডাকনাম বলেছে ধূর্জটিবাবুকে। আসলে সে প্ল্যানচেটে বসে নাটক করে ঠকাতে চাইছে ধূর্জটিবাবুকে। ব্যাপারটা ভেবে ভয় কেটে গিয়ে হাসি পেয়ে গেল তার। হাসি চেপে রেখে সে ধূর্জটিবাবু আর অনির্বাণের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, খুব কষ্ট খুব কষ্ট .। কোমরটা একদম ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে!' অনির্বাণের গলার স্বর যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

অনির্বাণ পারে বটে অভিনয় করতে। মনে মনে ভাবল পলাশ।

ধূর্জটিবাবু বললেন, 'ও, তার মানে অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে আপনার? কীভাবে?'

'একটা গাড়ি একটা গাড়ি চাপা দিল আমাকে সব শেষ ।' জবাব দিল অনির্বাণ।

'কী গাড়ি ছিল সেটা? বাস না লরি?'

'না, না, বাস নয়, একটা একটা অ্যাম্বাসাডর .। আজ দুপুরে পার্ক সার্কাসের মোড়ে ।'

এর পর সে কী বলল ঠিক বুঝতে পারল না পলাশ।

ধূর্জটিবাবু তার কথা শুনে বলে উঠলেন, 'তার নম্বর কত ছিল?'

পলাশের মনে হল, প্রশ্নটা করার সময় তাঁর গলাটা যেন কেঁপে উঠল।

BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপরই অনির্বাণের স্পষ্ট উত্তর শোনা গেল, 'ডব্লু বি কিউ ৫৫৫৫।'

তার কথা শোনার সঙ্গেসঙ্গেই অন্ধকারের মধ্যে প্রচণ্ড জোরে আর্তনাদ করে উঠলেন ধূর্জটিবাবু। তারপর দুম করে একটা শব্দ হল। পলাশের মনে হল ধূর্জটিবাবু যেন চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। পরক্ষণেই প্রচণ্ড জোরে হাসতে শুরু করল অনির্বাণ।

ব্যাপারটা কী হল ঠিক বুঝতে পারল না পলাশ বা নিলু। হাসতে হাসতে অনির্বাণ বলল, 'দেখ, দেখ, তোদের পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসা সিদ্ধপুরুষ নিজেই কেমন ভয় পেয়ে গেলেন।' তারপর সে হাসি থামিয়ে বলল, 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হয় তোর বিশ্বাসই ঠিক নিলু!'

তার কথা শেষ হওয়ার পর আবার ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ কীভাবে যেন ঘরের একটা দরজা শব্দ করে খুলে গেল। একঝলক ঠান্ডা বাতাস ঢুকল ঘরের ভিতর।

পলাশ বলল, 'ধূর্জটিবাবু, ও ধূর্জটিবাবু! আপনার কী হল? অনির্বাণ, অ্যাই অনির্বাণ?'

কিন্তু কারও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না। নিলুও তাদের নাম ধরে ডাকল। তারপর পকেট থেকে একটা লাইটার বের করে জ্বালল। মৃদু আলোয় তারা দেখতে পেল মাটিতে পড়ে আছেন ধূর্জটিবাবু। তাঁর মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরোচ্ছে।

কিন্তু অনির্বাণ ঘরের মধ্যে নেই। তার চেয়ার খালি। নিলু লাইটার দিয়ে মোমের টুকরোটা জ্বালিয়ে দিল। ধূর্জটিবাবুর পাঞ্জাবির পকেট থেকে টর্চটা ছিটকে পড়েছিল মেঝের উপর।

পলাশ সেটা চট করে কুড়িয়ে নিয়ে নিলুকে বলল, 'তুই ধূর্জটিবাবুকে দেখ। আমি দেখি অনির্বাণ কোথায় গেল? সে এভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেন?'

ঘর ছেড়ে খোলা দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল পলাশ। টর্চ জ্বালিয়ে সে দেখতে পেল, কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে ধূর্জটিবাবুর গাড়িটা। টর্চের আলো মাঠের বেশি দূরে যাচ্ছে না। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না মাঠে। বারান্দাতেও সে নেই।

BanglaBook.org

বারান্দা থেকে মাঠে নেমে কয়েক পা এগিয়ে টর্চের আলো চারপাশে ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করে বলে উঠল পলাশ, 'অনির্বাণ, অ্যাই অনির্বাণ, তুই কোথায় গেলি?'

ঠিক সেই সময় পলাশের পকেটে বেজে উঠল মোবাইলটা। কানে দিতেই ওপাশ থেকে মোবাইলে ভেসে এল পলাশদের বন্ধু অসীমের গলা, 'কে পলাশ? আমি অসীম বলছি। তোরা যেখানে আছিস সেখান থেকে এখনই কলকাতায় ফিরে আয়। খুব জরুরি। অনেকক্ষণ ট্রাই করার পর তোদের ধরতে পারলাম!'

পলাশ বলল, 'কেন, কী হয়েছে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অসীম বলল, 'অনির্বাণ আর নেই। আজ দুপুরে পার্ক সার্কাসের মোড়ে একটা অ্যাম্বাসাডর তাকে .।'

আর বলতে পারল না অসীম। কান্নায় ভেঙে পড়ল।

পলাশ তাকে চিৎকার করে বলল, 'কী বলছিস তুই? অনির্বাণ তো এক্ষুনি .।'

কথাটা শেষ করতে পারল না পলাশ। উত্তেজিতভাবে তার টর্চ ধরা হাতটা নাড়াতে গিয়ে টর্চের আলোটা যেন হঠাৎ আটকে গেল কিছু দূরে দাঁড়ানো ধূর্জটিবাবুর অ্যাম্বাসাডরের নম্বর প্লেটের উপর। পলাশ দেখতে পেল, সেখানে জ্বলজ্বল করছে গাড়ির নম্বরটা 'ডব্লিউ বি কিউ ৫৫৫৫'!

টর্চটা খসে পড়ল তার হাত থেকে!

BanglaBook.org

মৃত্যুযোগ

বাইরে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ। নিজের চেম্বারে গদি আঁটা চেয়ারে একলা বসে ছিলেন কালীকিংকর। সামনের টেবিলের দু-পাশে স্তূপাকৃত পঞ্জিকা। ভূতডামর, বগলামুখীতন্ত্র, বশীকরণবিদ্যা—এ-জাতীয় কয়েকটা বই, সাদা কাগজে আঁকা জন্ম ছক ইত্যাদি। আজ অমাবস্যা, তায় শনিবার! এসব দিনে সাধারণত, বি.বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিটের জ্যোতিষীদের চেম্বারে হাত দেখানোর জন্য লম্বা লাইন পড়ে যায়। আর কালীকিংকরের মতো যাঁদের বেশ নামডাক আছে, অর্থাৎ যাঁদের টেলিভিশনে দেখানো হয় অথবা ফি হপ্তায় কাগজে ছবি ছাপা হয়, তাঁদের এসব বিশেষ দিনে, অনেক লোককে ফিরিয়ে দিতে হয়। কিন্তু সন্ধ্যা ৭টা বেজে গেলেও আজ এখনও পর্যন্ত এক জনও হাত দেখাতে আসেনি কিংকর জ্যোতিষীর চেম্বারে। আর আসবেই বা কী করে? দুপুর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। থামার কোনো লক্ষণই নেই। দিনের বেলাতেই আকাশ অন্ধকার ছিল আর এখন সন্ধ্যার অন্ধকার তার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

'না, আজ আর কেউ আসবে না,' মাথাজোড়া টাকে একবার হাত বুলিয়ে নিজের মনে বললেন কালীকিংকর। এরপরই তিনি চেম্বার বন্ধ করে উঠে পড়বেন মনে করে তার অ্যাসিসটেন্ট কাম ড্রাইভার হরিপদকে হাঁক দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, তাকে তিনি একটা কাজে পাঠিয়েছেন। হরিপদ এখনও ফেরেনি। আর সে যতক্ষণ না ফিরবে তাকেও আটকে থাকতে হবে চেম্বারে। কালীকিংকরের টেবিলে একটা টেবিল ল্যাম্প রাখা আছে। তার হালকা আলো ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ঘরটা। বেশ কিছুদিন ধরে চেম্বারটা হালফ্যাশানের কায়দায় সাজাবেন বলে ভাবছেন, একটা কম্পিউটারও বসানোর ইচ্ছা আছে। যুগ পালটাচ্ছে, কম্পিউটারের সাহায্যে ভাগ্য গণনার আজকাল খুব চাহিদা।

BanglaBook.org

অনেক জ্যোতিষী বসিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু এসব কাজ করি করি করেও অন্য কাজের চাপে আর করা হয়ে উঠছে না তার। চেম্বারের দেয়ালে টাঙানো আছে সার সার ছবি, তার কোনোটাতে বিখ্যাত কোনো মানুষের সাথে কালীকিংকর, কোনোটা দশমহাবিদ্যার বা প্রসিদ্ধ সাধনপীঠের। যারা এখানে আসে তাদের মনের উপর, তাদের বিশ্বাসে, একটা প্রভাব বিস্তার করে এসব ছবি। কালীকিংকরের প্রতি একটা বাড়তি আস্থা জন্মায় ক্লায়েন্টের মনে।

ছবিগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে ঘরের কোনায় একটা ছবির দিকে তাকিয়ে চোখ আটকে গেল তাঁর। অনেকদিন পর তিনি তাকালেন ছবিটার দিকে। অনেক পুরোনো, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ। ঝুল জমেছে ফ্রেমে। এক জটাজূটধারী পুরুষের আবছা অবয়ব ফুটে আছে সেখানে। ও ছবি কালীকিংকরের গুরু মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিকের। তাঁর থেকেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন 'জ্যোতিষ সম্রাট কালীকিংকর'। 'জ্যোতিষ সম্রাট'! হ্যাঁ, এই উপাধিটাই কালীকিংকর ব্যবহার করেন তাঁর নামের আগে। জ্যোতিষ সম্রাট গুরু মৃত্যুঞ্জয় এক আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন! কাকচরিত্র, ললাটলিখন পাঠে অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। কোনো মানুষকে দেখে তিনি মুহূর্তের মধ্যে তার ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারতেন। তবে জ্যোতিষী বলতে সবাই এখন যা বোঝে, ঠিক সেই অর্থে কিন্তু তিনি জ্যোতিষী ছিলেন না। মহাবিদ্যার অন্যতম 'ধূমাবতী'র উপাসক শ্মশানচারী এই তান্ত্রিক আসলে ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ। তবে তিনি শুধু ভূত-ভবিষ্যতের কথাই বলতেন, কোনো বিধান দিতেন না। মৃত্যুঞ্জয় বলতেন, 'ভাগ্যের লিখন কেউ বদলাতে পারে না। আর মৃত্যু হল অপ্রতিরোধ্য, তাকে রোখার সাধ্য কারও নেই। বিধাতা পুরুষ জন্ম মুহূর্তে প্রত্যেকের যে আয়ু নির্দিষ্ট করে দেন, তা অমোঘ নিয়ম মেনে চলে। সে হিসাবের একচুলও এদিক-ওদিক করা সম্ভব নয়।' কালীকিংকর একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা, আপনার তো এত ক্ষমতা, আপনার ক্ষেত্রে কি একই বিধি প্রযোজ্য?'

তিনি হেসে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ রে বেটা। এই মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিকও মৃত্যুকে জয় করতে পারবে না। তিন কুড়ি বয়স আমার, আর এক কুড়ি বছর বাঁচব আমি। তার চেয়ে একদিন কম-বেশি নয়। ঠিক যেমন তোর আয়ু তিন কুড়ি বছর। তোর ক্ষেত্রেও অন্যথা হবে না।' হ্যাঁ, এই কথাই বলেছিলেন তিনি।

BanglaBook.org

ছবিটার দিকে তাকিয়ে অনেক দিন পর কথাগুলো আবার মনে পড়ে গেল কালীকিংকরের। মনে মনে হিসাব করতে লাগলেন তিনি, এইসব কতদিন আগের কথা হবে? তাঁর তখন প্রায় যুবা বয়স। চল্লিশ বছর আগের কথা এসব! মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিকের নিজের সম্পর্কে গণনা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে অন্তত কুড়ি বছর আগে গত হয়েছেন তিনি। তাঁর শেষ জীবনের খবর অবশ্য জানা নেই কালীকিংকরের। মাত্র বছর খানেক গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক টিকে ছিল, তারপর চির বিচ্ছেদ হয়ে যায় দু-জনের।

আসলে গুরুর উলটো পথে হাঁটতে শুরু করেছিলেন কালীকিংকর। গুরুর কাছে বেশ কিছু বিদ্যা শেখার পর লোভ তাঁকে পেয়ে বসেছিল। ভাগ্য পালটানোর বিধান দিতে শুরু করেছিলেন তিনি। মৃত্যু ভয়ে ভীত একজন লোককে মোটা অর্থের বিনিময়ে এক বার একটা তাবিজ দিয়েছিলেন কালীকিংকর। কথাটা কানে গেছিল মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিকের। শিষ্যকে সতর্ক করেছিলেন তিনি। কিন্তু কালীকিংকর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষই তাঁর জীবনের জাগতিক উন্নতির সোপান। মৃত্যুর হাত এড়াতে মানুষ তার সর্বস্ব সমর্পণ করতে পারে অন্যের হাতে। আর এ ব্যাপারটা যে কত বড়ো সত্যি, তার প্রমাণ কালীকিংকর নিজে। কোথায় বীরভূমের এক অখ্যাত গ্রামে ততোধিক অখ্যাত এক শ্মশানের, শবযাত্রীদের কৃপা অন্নে প্রতিপালিত মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিকের শিষ্য কালীকিংকর। আর কোথায় আজকের, 'জ্যোতিষ সম্রাট' কালীকিংকর! গাড়ি, বাড়ি, অর্থ, প্রতিপত্তি সম্মান, কী নেই আজ তাঁর? আর এ সবই তিনি পেয়েছেন, মানুষের মৃত্যুভয় আছে বলেই। চল্লিশ বছর আগের এক নিঃস্ব যুবক আজ একজন সফল মানুষ। তিনিই ঠিক—শেষের এই কথাগুলো ভেবে মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিকের ছবির দিকে তাকিয়ে একটা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন কালীকিংকর।

একলা ঘরে বসে নানা কথা ভাবতে লাগলেন তিনি। বৃষ্টি যেন আরও বাড়ছে। কড়াৎ কড়াৎ শব্দে কোথায় যেন বাজ পড়ল! আর তার পরেই বাতি নিভে গেল। টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে একটা মোমবাতি বার করে সেটা জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন কালীকিংকর। তিরতির করে মোমবাতির শিখাটা কাঁপছে। আধো অন্ধকার ঘর। মোমবাতির একটা আলোকরেখা

BanglaBook.org

কীভাবে গিয়ে যেন পড়ছে দেওয়ালের কোণে মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিকের সেই ছবির উপর। কালীকিংকরের চোখ আবার চলে গেল সেদিকে। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর কালীকিংকরের হঠাৎ মনে হল, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ছবিটা মোমের আলোতে কেমন যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ছবির ফ্রেমের ভিতর থেকে উজ্জ্বল চোখে যেন তার দিকে তাকিয়ে আছেন মৃত্যুঞ্জয়! তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে একটা হাসি! ছবিটার এই জীবন্ত হয়ে ওঠা হয়তো আলো-ছায়ার কারসাজি, কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে কালীকিংকর কেমন একটা যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন।

হরিপদ আসছে না, বৃষ্টিতে কলকাতার রাস্তার যা অবস্থা হয়! হয়তো জমা জলে আটকে গেছে তার গাড়ি! টেবিলেই রাখা ছিল হাল সনের পঞ্জিকা, কালীকিংকর সেটা খুলে পর দিনের গ্রহ-নক্ষত্র-রাশিফল দেখার জন্য তার পাতা উলটাতে লাগলেন। কাল রবিবার, জুলাইয়ের ছয়, বাংলার তেরোই আষাঢ়! পাতাটিতে পৌঁছে, বড়ো বড়ো হরফে লেখা বাংলা বছরের তারিখটা হঠাৎই যেন বিশেষ চেনা চেনা মনে হয় কালীকিংকরের। এ দিনটার কী একটা যেন আলাদা তাৎপর্য আছে। কিন্তু কী সেটা? কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অবশ্য তিনি ব্যাপারটা ধরে ফেললেন। আরে 'তেরোই আষাঢ়' তো তাঁর জন্ম দিন! কাজের চাপে ব্যাপারটা একদম ভুলেই গেছিলেন তিনি! কত বয়স হল তাঁর? মনে মনে হিসাব করলেন, কাল তিনি একষট্টিতে পা রাখতে যাচ্ছেন। 'দেখতে দেখতে ষাটটা বছর পার করে ফেললাম!' ব্যাপারটা ভেবেই নিজেই যেন তিনি একটু অবাক হয়ে গেলেন।

ঠিক সেই সময় হঠাৎ চেম্বারের দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে কালীকিংকর বললেন, 'কে? হরিপদ ফিরলি নাকি?'

ওপাশ থেকে ভেসে এল অন্য একটা গলার স্বর, 'না, মানে আমি হাত দেখাতে এসেছি . . .।'

এই দুর্যোগের মধ্যে কোনো ক্লায়েন্ট আসবেন তা ধারণা করতে পারেননি কালীকিংকর। মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল তাঁর। আজকের দিনটা তাহলে একদম নিষ্ফলা নয়! গম্ভীরভাবে কালীকিংকর বললেন, 'আসুন, ভিতরে আসুন।'

BanglaBook.org

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে সামনে এসে দাঁড়াল বছর পঁচিশের এক যুবক। পরনে দামি পোশাক, মনিবন্ধে দামি ঘড়ি। সম্ভবত গাড়িতে এসেছে, তাই বৃষ্টিতে ভেজেনি সে। নাকের ডগায় নামানো চশমার উপর দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পেশাদারী চোখে তাকে জরিপ করে নিয়ে কালীকিংকর বুঝতে পারলেন সম্ভবত বেশ পয়সাকড়ি আছে। 'জ্যোতিষ সম্রাটে'র চেহারাতেও একটা সম্ভ্রম জাগানো ভাব আছে। টকটকে ফর্সা রং, মাথাজোড়া বিরাট টাক, টিয়া পাখির মতো বাঁকানো নাকের ডগায় দামি রিমলেস চশমা, গলায় রুদ্রাক্ষের ছড়া, ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবি। প্রথম দর্শনেই একটা ভক্তি শ্রদ্ধা জাগে। ছেলেটা নমস্কার করে কালীকিংকরের মুখোমুখি উলটো দিকের চেয়ারে বসল।

কালীকিংকর তাঁর গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন কী সমস্যা? কোথা থেকে আসছেন আপনি?'

ছেলেটা বিষণ্ণ মুখে বলল, 'আমি অনিমেষ সেন। এই কলকাতাতে থাকি যোধপুর পার্কে। প্রমোটারি ব্যাবসা আছে আমার। ব্যাবসা ভালোই চলে। জানেন তো এসব কারবারে নানারকম অসুবিধা থাকে। অনেক সময় খুনোখুনি হয়। কিছুদিন ধরে এক মস্তান টাকার জন্য আমাকে হুমকি দিচ্ছে! দেখুন তো আমার কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই তো?' এই বলে সে তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল কালীকিংকরের দিকে।

টেবিলে রাখা আতস কাচটা তুলে নিলেন, তারপর তার হাতটা স্পর্শ করলেন কালীকিংকর। কী ঠান্ডা হাত, ঠিক যেন বরফ! আতস কাচের নীচে হাতটা দেখতে দেখতে তিনি কী করবেন চিন্তা করে নিলেন। মিনিট পাঁচেক হাত দেখার পর ছেলেটার জন্ম তারিখ জেনে নিয়ে একটা কাগজে বেশ কিছুক্ষণে রাশিচক্র আঁকিবুকি করে কালীকিংকর গম্ভীর মুখে তাকালেন ছেলেটার দিকে। ছেলেটার চোখে স্পষ্ট উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে।

কী বলবেন ভাবা হয়ে গেছে কালীকিংকরের। তিনি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যা দেখছি ব্যাপারটা ভালো নয়। মঙ্গল ভীষণ কুপিত, তা ছাড়া আপনার অপঘাতে মৃত্যুযোগও আছে!'

'মৃত্যুযোগ'! চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল ছেলেটা।

'হ্যাঁ, মৃত্যুযোগ। জ্যোতিষ সম্রাট কালীকিংকরের গণনা মিথ্যা হয় না।' বললেন তিনি।

BanglaBook.org

ছেলেটা তা শুনে বেশ ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, 'কী হবে তাহলে? আপনি একটা ব্যবস্থা করুন যাতে রক্ষা পাই আমি। আমি বাঁচতে চাই।' ছেলেটার গলার স্বর কেঁপে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত গভীর চিন্তার ভান করে কালীকিংকর বললেন, 'প্রতিকার অবশ্য একটা আছে। পাঁচ রতির একটা চুনি ধারণ করতে হবে।'

ছেলেটা বলল, 'তাহলে সেটা কোথায় পাওয়া যাবে? কীরকম দাম হবে? যাই হোক না কেন আমি নেব।'

জ্যোতিষী বুঝলেন তার ওষুধ ধরেছে। তিনি বললেন, 'আমার কাছে পাওয়া যাবে। তবে, আজেবাজে জিনিস আমি রাখি না। খাঁটি বর্মি চুনি। হাজার কুড়ি টাকার মতো পড়বে।' এই বলে তাঁর রিভলবিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে তার ঠিক পিছনেই দেওয়ালের গায়ে গাঁথা লোহার সিন্দুক খুলে একটা ছোটো বাক্স বার করে আনলেন। তার মধ্যে বেশ কয়েকটা তুলোট কাগজের মোড়ক। একটা মোড়ক খুলে তিনি ছেলেটার সামনে মেলে ধরতেই মটর দানার মতো লাল পাথর মোমের আলোতে চকচক করে উঠল!

ছেলেটা কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'এতে কাজ হবে তো?'

কালীকিংকর বললেন, 'নিশ্চয়ই হবে। একদম খাঁটি রত্ন। এটা ধারণ করলে মৃত্যু আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না।' তাঁর কথা শুনে ছেলেটার চোখ ঝলমল করে উঠল। পরক্ষণেই প্যান্টের পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করল কালীকিংকরকে দেবার জন্যে।

মিনিট পাঁচেক সময় লাগল রসিদ-টসিদ কাটার জন্য। কড়কড়ে পাঁচশো টাকার নোটগুলো গুনে দিয়ে চুনিটা নিয়ে হাসিমুখে ছেলেটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাসি কালীকিংকরের মুখেও। টাকাগুলো সিন্দুকে রেখে তিনি ছেলেটার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্তে যান, প্রয়োজন হলে আবার আসবেন।'

হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে ছেলেটা বলল, 'আপনি আমাকে বাঁচালেন। অবশ্যই আসব।' এরপর সে বাইরের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'দরজার বাইরে বেঞ্চে আরও দু-জন আছে। মনে হয় তারাও হাত দেখাবেন। ভিতরে পাঠিয়ে দেব কি?'

এই বৃষ্টিতে আরও দু-জন! ব্যাপারটা ভাবতে পারেননি কালীকিংকর।

BanglaBook.org

এই দুর্যোগের দিনেও লক্ষ্মীদেবী তাঁর প্রতি প্রসন্ন! মনটা নেচে উঠল তাঁর। কিন্তু মনের ভাব গোপন করে তিনি বললেন, 'আজকেও দেখছি আমার মুক্তি নেই। এক জনকে ভিতরে আসতে বলুন।' এমন ভাবে তিনি কথাগুলো বললেন, যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত দেখতে হবে তাঁকে।

যে ভদ্রলোক এবার কালীকিংকরের সামনের চেয়ারে বসলেন তিনি মধ্যবয়সী। পরনে ধূসর রঙের দামি থ্রি-পিস সুট। সুন্দরভাবে কামানো ফর্সা মুখ। চোখের চশমাটাও সোনার বলেই মনে হয়। বেশ একটা আত্মবিশ্বাসের ভাব আছে লোকটার মধ্যে। কিন্তু সে বিশ্বাসে নিশ্চয়ই টোল খেয়েছে। নইলে ইনি জ্যোতিষীর দরবারে হাজির হবেন কেন? জ্যোতিষদের পেশায় ক্লায়েন্টদের সাইকোলজি বোঝাটা বেশ জরুরি। অভিজ্ঞ কালীকিংকর ধরতে পারলেন এই ব্যাপারটা।

চেয়ারে বসার পর লোকটা একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আমার নাম অবনী হালদার। পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজস্ব ফার্ম আছে। কয়েক মাস ধরে একটা ভয় তাড়া করে বেড়াচ্ছে আমাকে। কোনো কাজে মন বসাতে পারছি না। তাই আপনার কাছে এসেছি। যদি কোনো পাথর-টাথর .।' কথাটা আর শেষ করলেন না তিনি।

'কী ভয়?' স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন কালীকিংকর।

অবনী হালদার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দিলেন, 'মৃত্যুভয়।'

এরও মৃত্যুভয়? এ তো মেঘ না চাইতে জল! সোজা হয়ে বসে কালীকিংকর জানতে চাইলেন, 'কীসের মৃত্যুভয়?'

অবনী হালদার বললেন, 'আমার পেটে একটা ব্যথা আছে দীর্ঘ দিন ধরে। ডাক্তারের পিছনে অনেক পয়সা ঢেলেও কোনো কাজ হচ্ছে না। মাস তিনেক ধরে ব্যথাটা ক্রমশই বাড়ছে। যদিও ডাক্তারেরা এখনও ফাইনালি কিছু বলেননি। তবে একটা আশঙ্কা ক্রমশই দানা বাঁধছে আমার মনে। আসলে আমার বাবা-ঠাকুরদাও ওই রোগে আমারই মতন বয়সে চলে গেছেন। আমার ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে আর বেশি দিন বাঁচব না আমি। এ রোগের এখনও কোনো চিকিৎসা বেরোয়নি।' কথাগুলো একটানা বলার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অবনী হালদার বললেন, 'আপনার অনেক নাম

BanglaBook.org

শুনেছি। তাই আপনার কাছে এসেছি। টাকাপয়সার ব্যাপারে আমি কোনো কার্পণ্য করব না, দেখুন যদি কিছু করতে পারেন।'

তাঁর কথা শোনার পর কালীকিংকর শুধু বললেন, 'আপনার ডান হাতটা দেখি।' অবনী হালদার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর অনামিকায় জ্বলজ্বল করছে একটা চুনি বসানো সোনার আংটি। ঠিক যেমন একটা চুনি একটু আগে তিনি ছেলেটাকে দিলেন, ঠিক সেইরকম। আংটিটা দেখে কালীকিংকরের বুঝতে অসুবিধা হল না যে, ইতিপূর্বে কোনো কারণে কোনো-না-কোনোদিন কোনো জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। হয়তো সেখান থেকেই কোনো কারণে পাথর-টাথরে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে।

বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই। ঘন ঘন বাজের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অবনী হালদার বললেন, 'কী বুঝলেন বলুন? আমার ধারণাই কি ঠিক? বাপ-ঠাকুরদার মতোই কি এই বয়সেই মৃত্যুযোগ লেখা আছে আমার ভাগ্যে?' কথাগুলো বলতে গিয়ে অবনী হালদারের গলার স্বর কেঁপে উঠল।

কালীকিংকর একটা আক্ষেপের ভাব গলায় ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'দুশো সেন্ট অর্থাৎ অন্তত দুই রতির একটা বেলজিয়াম হিরে ধারণ করতে হবে আপনাকে। হাজার চল্লিশের মতো দাম পড়বে পাথরের। পারবেন?'

অবনী হালদার বলে উঠলেন, 'পারব না কেন? হিসাব করলে দেখা যাবে যে, এর চেয়ে অনেক বেশি টাকা আমি ডাক্তারের পেছনে ঢেলেছি। ও টাকা এখনি আমার সঙ্গে আছে। কোন জুয়েলারি দোকানে ও পাথর পাওয়া যাবে বলুন? আমি এখনই কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরব।'

কালীকিংকর বললেন, 'এই বৃষ্টির রাতে এখন দোকান হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আপনাকে একটা কথা বলি, ক্লায়েন্টদের সুবিধার জন্য কয়েকটা দামি পাথর আমি রেখে দিই। দু-রতি হিরে আমার কাছে আছে। দাঁড়ান আপনাকে দেখাচ্ছি।' এই বলে সিন্দুকের দিকে ফিরলেন কালীকিংকর, আর কয়েক মুহূর্ত পরই তাঁর হাতের তালুতে ছোট্ট একটা পাথর নিয়ে তা মেলে ধরলেন ভদ্রলোকের সামনে। মোমের আলোতে ঝলমল করে উঠল বেলজিয়াম হিরে।

পাথরটার দিকে তাকিয়ে অবনী হালদার বিস্মিতভাবে বললেন, 'এই পাথর সত্যিই আমার মৃত্যুযোগ দূর করতে পারবে?'

BanglaBook.org

শান্ত গলায় জ্যোতিষ সম্রাট বললেন, 'হ্যাঁ, এই হিরেই একমাত্র পারে আপনার মৃত্যুযোগ দূর করতে।' লেনদেনের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। হিরে নিয়ে চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন অবনী হালদার নামের ভদ্রলোক।

অবনী হালদারের টাকাগুলো সিন্দুকে তুলে রেখে ঘড়ির দিকে তাকালেন কালীকিংকর। আটটা বাজে। হরিপদর এখনও দেখা নেই। একটু ভয় ভয় লাগল। এতগুলো টাকা! দিনকাল মোটেই ভালো নয় আজকাল। সিন্দুকে ভালো করে চাবি দিয়ে সেটা তিনি ট্যাঁকে তুলতে যাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় দরজার কাছ থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর, 'আমি কি ভিতরে আসব?'

কালীকিংকরের হঠাৎ খেয়াল হল, ও, আরও এক জন তো অপেক্ষা করছেন। 'হ্যাঁ, ভিতরে আসুন,' জবাব দিলেন কালীকিংকর।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক, বয়স মনে হয় সত্তরের উপরে হবে। চোখে চশমা, চুনোট ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম, হাতে রুপো-বাঁধানো ছড়ি। নমস্কার জানিয়ে চেয়ারে বসলেন তিনি। কালীকিংকর ভালো করে দেখলেন তাঁকে। সম্ভ্রান্ত চেহারা ভদ্রলোকের। স্বভাব সুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে কালীকিংকর বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন, কী সমস্যায় এসেছেন আপনি? কী করা হয়?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম অঘোর চক্রবর্তী। একসময় সরকারি দপ্তরে বেশ একটা উঁচু পদে চাকরি করতাম। একলা মানুষ। বর্তমানে বাড়িতে ধর্মকর্ম নিয়েই সময় কাটাই। জ্যোতিষে আমার বিশ্বাস আছে। বয়স পড়ে এল। শেষ বয়সে একটু ললাটলিখনটা জানতে এসেছি। আপনি ললাটলিখন পড়তে পারেন? আমার যা বয়স তাতে হস্তরেখা সব হারিয়ে গেছে।'

কালীকিংকর বললেন, 'পারব না? সব বিদ্যাই আমার জানা আছে। একসময় মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিকের শিষ্য ছিলাম আমি।' সাধারণত এই কথাটা বলেন না তিনি। নিজের অজান্তেই যেন মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিকের নামটা অনেক দিন পর তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল!

বৃদ্ধ বললেন, 'ও মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক! আমি নাম শুনেছি তাঁর।' বৃদ্ধ তাঁকে খুশি করার জন্য কথাটা বলল কি না, তা বুঝতে পারলেন না কালীকিংকর।

BanglaBook.org

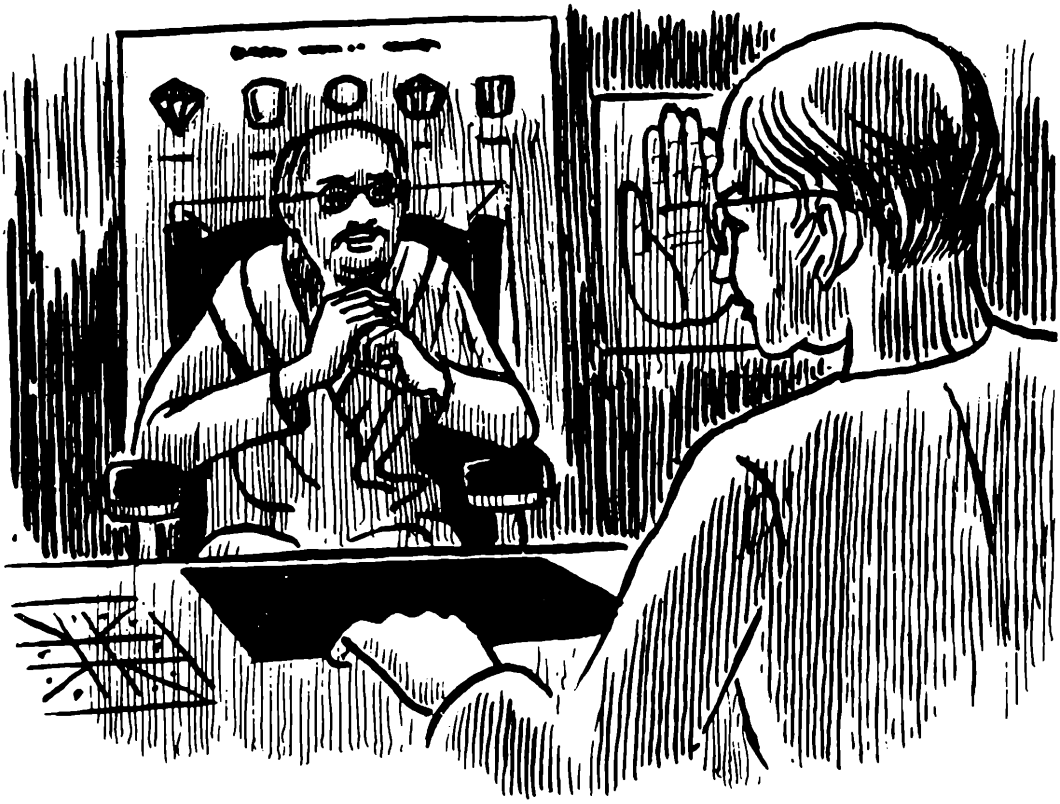

তাঁর কপালের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কালীকিংকর বললেন, 'আপনার জন্ম তারিখটা বলুন। ললাটরেখার সাথে জন্ম তারিখ মিলিয়ে তার পর আমাকে যা বলার বলতে হবে।'

তারিখটা বলে দিলেন ভদ্রলোক। কাগজে আঁক কাটতে কাটতে কালীকিংকর ভাবলেন, 'এ লোকটারও পয়সা ভালোই আছে। তার সিন্দুকে একটা পান্নার আংটি রাখা আছে। ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি আজ সুপ্রসন্ন। খেলাটা এ লোকটার ক্ষেত্রেও খেলে দেওয়া যাক। বৃদ্ধ হলেও সকলেরই তো বাঁচার আকাঙ্খা থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ আঁকজোক করার পর কাগজের দিকে চোখ রেখে জ্যোতিষী বললেন, 'যা দেখলাম সুবিধার মনে হচ্ছে না। আজকাল সত্তর বছর বয়স মরার বয়স নয়। কিছু মনে করবেন না, আপনার ললাটলিখন বলছে শীঘ্রই আপনার মৃত্যুযোগ আছে।'

'মৃত্যুযোগ! তাই লেখা আছে?' একটা বিস্মিত কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল বৃদ্ধর গলা থেকে।

কালীকিংকর এরপর বললেন, 'হ্যাঁ, তাই তো লেখা আছে। তবে যদি

BanglaBook.org

হাজার দশেক খরচ করতে পারেন, তাহলে এই যাত্রায় ফাঁড়াটা কেটে যেতে পারে। একটা কলোম্বিয়ান পান্না ধারণ করতে হবে। আমার কাছে একটা আছে। রুপোর আংটিতে বসানো। সস্তাতেই দিয়ে দেব।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ও টাকা আমি এখনই দিতে পারি কিন্তু . . .।'

টাকা যখন ভদ্রলোক দিতে পারেন, তখন তাকে বেশি কথা বলতে দিলে অসুবিধা হতে পারে। তাই কালীকিংকর বলে উঠলেন, 'টাকা যখন আপনার কাছে, তখন আংটিটা নিতে দ্বিধা করবেন না। জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার বলে কথা! দাঁড়ান, জিনিসটা আমি আপনাকে বার করে দেখাই।' এই বলে সিন্দুকের দিকে চেয়ারের মুখ ফেরালেন কালীকিংকর।

আংটিটা বার করে কালীকিংকর বললেন, 'দিন ডান হাতটা দেখি। মনে হয় হয়ে যাবে। নইলে কাল স্যাকরার কাছে নিয়ে যাবেন।'

বৃদ্ধ তাঁর হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। মোমের আলোতে সে হাতে দুটো আঙুল ঝিলিক দিয়ে উঠল। আরও দুটো দামি পাথর রয়েছে তাঁর আঙুলে। আংটি পরাবার জন্য তাঁর আঙুল স্পর্শ করলেন কালীকিংকর। কী বরফের মতো ঠান্ডা সে হাত! আংটিটা বৃদ্ধের তর্জনীতে পরিয়ে সে দিকে তাকিয়ে রইলেন জ্যোতিষ সম্রাট। অন্য দুটো পাথরের পাশে বেশ মানিয়েছে সবুজ রঙের পাথরটা। কিন্তু তারপরই অন্য দু-আঙুলের পাথর দুটোও যেন চেনা চেনা মনে হল তাঁর।

ঠিক সেই সময় বৃদ্ধ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'পাথর কি মৃত্যুযোগকে খণ্ডাতে পারবে! ভাগ্যের লিখন কেউ বদলাতে পারে না। আর মৃত্যু হল অপ্রতিরোধ্য। তাকে রোখার সাধ্যি কারও নেই।'

কথাটা শুনেই চমকে উঠে বৃদ্ধর দিকে তাকালেন জ্যোতিষ সম্রাট কালীকিংকর। এ কার কণ্ঠস্বর! বৃদ্ধর ঠোঁটের কোণে যেন ফুটে উঠেছে একটা হাসি। মোমের শিখাটা দপদপ করতে শুরু করেছে নিভে যাবার আগে। সে আলোতে কালীকিংকর দেখলেন, বদলে যাচ্ছে বৃদ্ধর মুখ। বয়স কমছে তাঁর! অঘোর চক্রবর্তী থেকে অবনী হালদার তার থেকে অনিমেষ সেন! কালীকিংকর চিৎকার করে উঠলেন, 'কে! কে আপনি?'

বাইরে কোথায় যেন প্রচণ্ড জোরে বাজ পড়ল, কেঁপে উঠল সারা ঘর। মোমবাতির শিখাটা শেষ বারের মতো একবার দপ করে জ্বলে উঠল।

BanglaBook.org

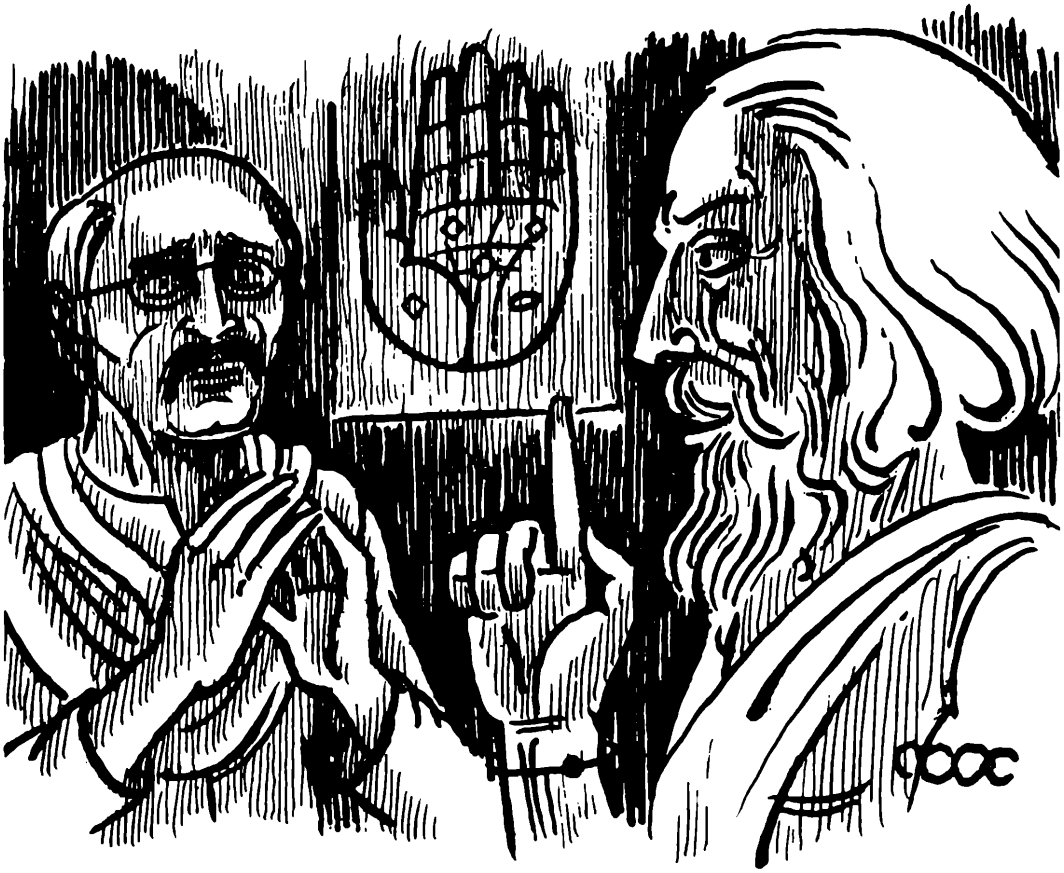

মুহূর্তের জন্য কালীকিংকর দেখতে পেলেন তাঁর সামনে বসে আছেন জটাজূটধারী এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী! পর মুহূর্তেই ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে ভেসে এল বহুদিন আগে কালীকিংকরের শোনা এক পরিচিত কণ্ঠস্বর, 'বিধাতা পুরুষ জন্ম মুহূর্তে প্রত্যেকের আয়ু নির্দিষ্ট করে দেন। তার আর অন্যথা হয় না। আমার ক্ষেত্রেও হয়নি, তোর ক্ষেত্রেও হবে না ।' কথাগুলো অনুরণিত হতে লাগল অন্ধকার ঘরের মধ্যে।

BanglaBook.org

আতঙ্কিত কালীকিংকর টেবিল ছেড়ে উঠে পালাতে গেলেন, কিন্তু যে হাতে তিনি পাথরটা পরালেন, সেই হাত ততক্ষণে চেপে ধরেছে তাঁর হাত। অন্ধকারে মধ্যে শুধু সেই হাতটাকেই দেখতে পাচ্ছেন কালীকিংকর। সে হাতে রক্ত মাংস কিছু নেই, সাদা ফ্যাটফেটে কতগুলি হাড়! আর তাতে পরানো আছে মৃত্যুযোগ কাটানোর জন্য তাঁর দেওয়া হিরে-চুনি-পান্না! একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল কালীকিংকরের গলা থেকে। বাজের শব্দে ঢেকে গেল কালীকিংকরের আর্তনাদ।

পরের দিন সংবাদপত্রে একটা ছোট্ট খবর ছাপা হল, 'জ্যোতিষ সম্রাট কালীকিংকর গত কাল রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। যৌবনে তিনি ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিকের শিষ্য। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ষাট বছর। আজ তেরোই আষাঢ় ছিল তাঁর একষট্টিতম জন্মদিন।'

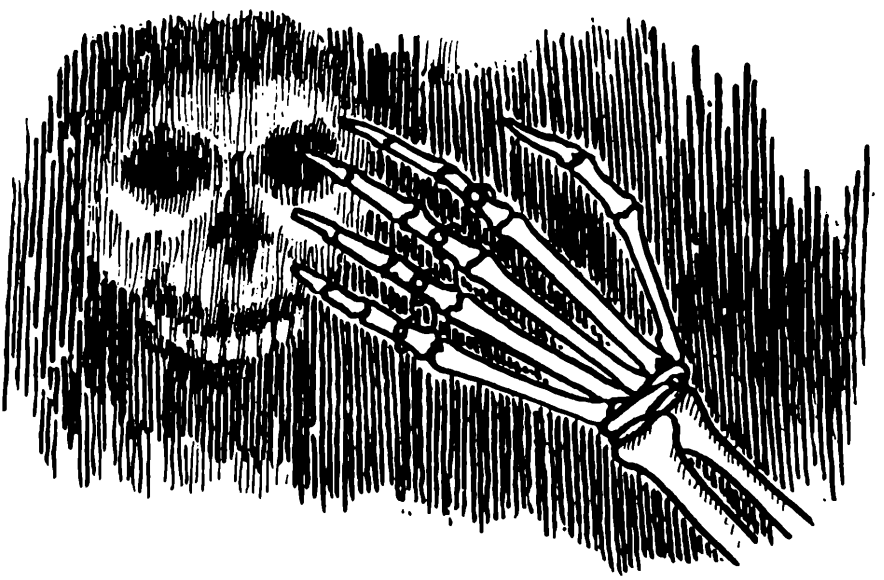

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আঁধার রাতের বন্ধু

পুজোর আগের দুটো মাস খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটে 'দৈনিক হইচই' পত্রিকার সম্পাদক হলধর সামন্তর। লিটিল ম্যাগাজিন দিয়ে জীবন শুরু করে ছিলেন একসময়, তারপর আস্তে আস্তে বড়ো কাগজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, তারপর একসময় সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়া। বিগত চল্লিশ বছরের এই দীর্ঘপথ পরিক্রমায় লেখক-পাঠক মহলে তার পরিচিতি সর্বত্র। আর এই সুবাদেই পুজো সংখ্যা প্রকাশের আগে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়তে হয় তাঁকে। এক-এক সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, দপ্তরে বসে কাজ করা পর্যন্ত মুশকিল হয়ে ওঠে। নানা অনুরোধ-উপরোধের ঠেলায় জেরবার হয়ে যান তিনি।

পুজো সংখ্যার লেখা নির্বাচনের কাজটা বরাবরই নিজেই করে থাকেন হলধরবাবু। কিন্তু দপ্তরে থাকলে পাণ্ডুলিপি দেখার কাজ হয়ে ওঠে না। তাই অফিসের নিত্যদিনের ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে গত সাত দিন ধরে কলকাতা থেকে কিছু দূরের এক শহরতলিতে আত্মগোপন করে বসে আছেন হলধরবাবু। এখানে এসে পাণ্ডুলিপি দেখার কাজ প্রায় নব্বই শতাংশ শেষ করে ফেলেছেন। কালই কলকাতায় ফিরে যাবেন। রাত প্রায় দশটা বাজে। এখানে রাত দশটা মানে অনেক রাত। এখনও বিদ্যুৎ এসে পৌঁছোয়নি। সন্ধ্যে থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দু-কামরার এই ছোট্ট বাড়িতে একলা বসে হ্যারিকেনের আলোতে পাণ্ডুলিপির খাতা উলটাচ্ছেন হলধর। একটা সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা ইতস্তত করছেন। তাঁর সামনে এখন মাত্র দুটো পাণ্ডুলিপি। তার মধ্যে একটা হল কল্পবিজ্ঞানের বিখ্যাত লেখক কাশীনাথ সাঁতরার গল্প 'স্ফটিক গ্রহের যাত্রী', আর একটা হল 'আঁধার রাতের বন্ধু' নামে একটা ভূতের গল্প। লেখকের নাম নিশিকান্ত হাজরা।

নিশিকান্ত হাজরার নাম কোনোদিন লেখক হিসাবে শুনেছেন বলে মনে করতে পারলেন না হলধরবাবু। তবে ভদ্রলোক লিখেছেন বেশ জব্বর।

BanglaBook.org

সত্যিকথা বলতে কী, কাশীনাথ সাঁতরার চেয়ে নিশিকান্তর লেখাটাই অনেক বেশি মনে ধরেছে। নিরপেক্ষভাবে ছাপতে গেলে নিশিকান্তর লেখাই ছাপতে হয় তাকে। কিন্তু মুশকিল হল পত্রিকা চালাতে হলে শুধু লেখা নয় আরও অনেক কিছু খেয়াল রাখতে হয়। কাশীনাথ সাঁতরা নামী লেখক, তার নামে পত্রিকার পাবলিসিটির দিকটা ভালো হবে। অপরদিকে নিশিকান্ত অজ্ঞাতকুলশীল। তার লেখাটা ভালো হলেও একটা রিস্ক থেকে যায়।

হলধরবাবু সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে একমনে চিন্তা করতে লাগলেন। এমনসময় হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। নিশ্চয়ই শঙ্কর বলে ছেলেটা রাতের খাবার এনেছে। টেবিল থেকে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন হলধর। কিন্তু দরজা খুলতেই ভয়ংকর চমক। না শঙ্কর নয়, বছর ষাটেকের এক ক্ষীণকায় ভদ্রলোক। বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে গেছেন। লন্ঠনের আলোয় যতটুকু দেখলেন তাতে তাঁকে খারাপ লোক বলে মনে হল না হলধরের। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কাকে চাই?'

ভদ্রলোক কিছুটা ইতস্তত করে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমি অনেক দূর থেকে এখানে এসেছিলাম একটা কাজে। ফিরতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। ভেবেছিলাম দশটার বাসটা ধরতে পারব। কিন্তু বাস চলে গেল সামনে দিয়ে। শেষ বাস রাত বারোটায়। এখনও প্রায় দু-ঘন্টা বাকি। দোকানপাটের আলোও সব নিভে গেছে। ভেবেছিলাম বাস স্ট্যান্ডেই সময়টা কাটিয়ে দেব। কিন্তু এত জোরে বৃষ্টি শুরু হল যে, ওখানে আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। তাই আশেপাশে কোথায় আশ্রয় পাওয়া যায় কি না খুঁজতে খুঁজতে .।'

ভদ্রলোক আর কথাটা শেষ করলেন না। হলধরবাবু বললেন, 'ভিতরে আসুন।'

ভেতরে ঘরের কোনায় একটা চেয়ার রাখা আছে। ভদ্রলোক তার ওপরে বসে বললেন, 'ধন্যবাদ, আজকালকার বাসগুলো যা হয়েছে মশাই, হাত দেখালাম তবু থামল না।'

হলধরবাবু বললেন, 'বাসস্ট্যান্ড তো এখান থেকে অনেকদূর। এতটা পথ বৃষ্টির মধ্যে এলেন কী করে?'

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'আসলে অচেনা জায়গা। হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ড থেকে এতটা দূর চলে এসেছি, বুঝতে পারিনি।'

BanglaBook.org

একটু থেমে বললেন, 'আপনি কাজ করছিলেন দেখছি। আপনার অসুবিধা করলাম। বৃষ্টি একটু কমলেই আমি চলে যাব।'

'ঠিক আছে, ব্যস্ত হবার কিছু নেই।' এই বলে টেবিলের সামনে বসে হলধরবাবু ডুবে গেলেন নিজের কাজে। যেকোনো একটা লেখাকে নির্বাচন করতে হবে। দুটো লেখা ছাপাবার মতন জায়গা নেই।

বাইরে বৃষ্টি আরও জোরে শুরু হয়েছে। হলধরবাবু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন কাশীনাথ সাঁতরার লেখাটাই ছাপবেন। কাশীনাথবাবুকে চটিয়ে লাভ নেই। সামনের ডিসেম্বরে কাশীনাথবাবুর লেখক জীবনের পঁচিশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। হলধরবাবু ভেবে রেখেছেন 'হইচই' প্রকাশনা সংস্থা থেকে কাশীনাথের একটা গল্প সংকলন বার করবেন। বইয়ের নামটাও মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন। 'পঁচিশ বছরের শ্রেষ্ঠ কল্পবিজ্ঞানের গল্প'।

পাণ্ডুলিপির ওপর মনোনীত কথাটা লিখতে যাবেন, এমন সময় চেয়ারে

BanglaBook.org

বসা ভদ্রলোক হঠাৎ বলে উঠলেন, 'যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা বলি।'

হলধরবাবু গলার শব্দ পেয়ে প্রথমে চমকে গেছিলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেছে এরমধ্যে। চিন্তাভাবনায় থাকার জন্য ভদ্রলোকের উপস্থিতি ভুলতে বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ভূতের গল্প বলেই কি লেখাটা বাদ হল?'

হলধর একটু আশ্চর্য হলেন। ভদ্রলোক জানলেন কী করে যে নিশিকান্তর লেখাটা তিনি মনোনীত করেননি! তারপর ভাবলেন ভদ্রলোক হয়তো কোনো সময় তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি খেয়াল করেননি। অনেকের এমন স্বভাব থাকে। টেবিলের ওপর পত্রিকার ঠিকানা লেখা অনেক পাণ্ডুলিপির প্যাকেট আছে। ভদ্রলোক হয়তো বুঝতে পেরেছেন তিনি লেখা নির্বাচন করতে বসেছেন। হলধরবাবু কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেও জবাব না দেওয়াটা নিতান্তই অভদ্রতা হবে মনে করে বললেন, 'বিজ্ঞানের যুগ, গাঁজাখুরি ভূতের গল্পর বদলে কল্পবিজ্ঞানের গল্প ছাপানোই ভালো।'

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, 'আপনার কাশীনাথ সাঁতরার গল্পের নায়ক দু-হাজার আলোকবর্ষ দূরের স্ফটিক গ্রহে বসে বেগুনি দিয়ে মুড়ি খাচ্ছে—সেটা গাঁজাখুরি হল না, শুধু ভূতের গল্প বলেই গাঁজাখুরি হল!'

হলধরবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন ভদ্রলোকের কথা শুনে। সত্যিই তো কাশীনাথ সাঁতরার গল্পের নায়ক 'রোবট দত্ত' স্ফটিক গ্রহে বসে বেগুনি-মুড়ি খাচ্ছে গল্পের মধ্যে। কিন্তু এটা তো ভদ্রলোকের জানার কথা নয়। ভদ্রলোকের মুখের দিকে এবার সোজাসুজি তাকালেন হলধর। কী আশ্চর্য! ভদ্রলোকের বয়স যে হঠাৎ বছর কুড়ি নীচে নেমে গেছে! হলধরবাবুর মাথার ভেতরে কেমন জানি সবকিছু জট পাকিয়ে যেতে লাগল। বুকের ভেতর যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে কে। হলধরবাবু মনের সব জোর একত্রিত করে বললেন, 'আপনি কে? এত কিছু জানলেন কী করে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি জানি। কিন্তু আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা এখনও পেলাম না।'

হলধরের সমস্ত চিন্তা আস্তে আস্তে যেন লোকটার নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

আপ্রাণ চেষ্টা করেও যেন নিজের মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছেন না। অসহায় হলধর এবার জবাবদিহির সুরে বলতে আরম্ভ করলেন, 'মানছি, ভূতের গল্পটা কাশীনাথবাবুর গল্পের চেয়ে ভালো। কিন্তু ভূতের গল্প যিনি লিখে পাঠিয়েছেন তার নাম আগে কোনোদিন শুনিনি, লেখাও কোনো কাগজে পড়িনি। একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল! হয়তো তিনি বড়ো কোনো লেখকের প্রকাশিত গল্প কপি করেছেন। এমন ঘটনা অনেক সময় হয়। এই নিয়ে পরে যদি বিপত্তি হয় তাহলে কী কৈফিয়ত দেব আমি? আমিও তো চাকরি করি।'

লোকটা শুনে বলল, 'কপির কথা যখন বললেন তাহলে বলি, আজ দুপুরে নামী লেখক হরিদাস গায়েনের 'হাকিমপুরের হত্যা রহস্য' বলে যে লেখাটা পুজো সংখ্যার জন্য নির্বাচন করলেন তার প্লট তো চল্লিশ বছর আগে রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত বেণীমাধব সরখেলের নরপিশাচ

গল্প থেকে হুবহু কপি করা। শুধু পাত্র-পাত্রীর নামটা পরিবর্তন করা হয়েছে।'

হলধরবাবু বিস্মিত হলেন লোকটার কথাগুলো শুনে। কিশোর বয়সে তিনি রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। এখনও বাড়িতে তাঁর বাঁধানো খণ্ডগুলো রাখা আছে। নরপিশাচ গল্পটা তিনিও পড়েছিলেন। তাই দুপুরে পাণ্ডুলিপি দেখার সময় বারবারই মনে হচ্ছিল হরিদাস গায়েনের লেখাটা আগে যেন কোথাও দেখেছেন। নামী লেখক বলে মনের সন্দেহ দূরে রেখে ছাড়পত্র দিয়েছেন। দু-হাত দিয়ে মাথাটা জোরে চেপে ধরে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন হলধর। প্রতিটা মুহূর্ত যেন এক-একটা ঘণ্টা।

'এবার তাহলে আসি হলধরবাবু।'

নিজের নামটা শুনে হলধরবাবু আস্তে আস্তে তাকালেন লোকটার দিকে। তার সামনে এখন দাঁড়িয়ে হাসছে বছর কুড়ি বয়সের এক যুবক।

'আর তো বয়স কমানো যাবে না হলধরবাবু। ভালো থাকবেন। নমস্কার।'

হলধরবাবুকে নমস্কার করে ধীর পায়ে সে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। বেরোবার সময় লন্ঠনের মৃদু আলোয় হলধর লক্ষ করলেন তার বাঁ-গালে বড়ো একটা আঁচিল।

খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে হতভম্বের মতন বসে ছিলেন হলধরবাবু। সংবিৎ ফিরল খাবার নিয়ে আসে যে ছোকরা, সেই শঙ্করের ডাকে। রাত এখন বারোটা। বৃষ্টির জন্য আসতে তার অনেকটা দেরি হয়েছে। তাকে কিছু বললেন না হলধরবাবু এতক্ষণ হয়তো তিনি একটা স্বপ্ন দেখছিলেন। খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন হলধরবাবু।

সারারাত ভালো করে ঘুম হল না তাঁর। বারবারই কেন জানি স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলেন সেই আঁচিলওলা গালটা।

ভোর বেলা উঠেই হলধর গাড়ি নিয়ে সোজা রওনা দিলেন কলকাতায়। মনের মধ্যে ক্রমশ একটা সন্দেহ দানা বাঁধছে তাঁর। বাড়ি পৌঁছে তিনি আলমারির তাক থেকে অনেকদিন পরে নামিয়ে আনলেন একটা পুরোনো ছবির অ্যালবাম। অ্যালবামের অধিকাংশ ছবিই তাঁর কৈশোর-যৌবনের।

BanglaBook.org

পাতা উলটে দেখতে দেখতে খুঁজে বার করলেন বিবর্ণ হয়ে যাওয়া একটা ছবি। কিশোর বয়সে যখন তিনি মফস্‌সল শহরে থাকতেন সেই সময়কার স্টুডিয়োতে তোলা একটা গ্রুপ ছবি। চশমার কাঁচটা ধুতির খুট দিয়ে ভালো করে মুছে ছবিটাকে চোখের সামনে তুলে ধরলেন। ছবিতে জনা দশেক ছেলের মধ্যে তিনিও আছেন। সে আজকের মেদবহুল-পক্ককেশ-মোটা চশমাধারী হলধর নয়, চল্লিশ বছর আগের ছিপছিপে কিশোর হলধর। আর তার একপাশে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে হলধরের সমবয়সি। ভালো করে লক্ষ করে হলধর দেখতে পেলেন তার বাঁ-গালে একটা বড়ো আঁচিল। হাজু-হাজরা—নিশিকান্ত—নিশিকান্ত হাজরা। জলের মতন সবকিছু মনে পড়ে গেল হলধরবাবুর। নিশিকান্ত চল্লিশ বছর আগের মানদাসুন্দরী স্কুলের ফার্স্ট বয়, হলধরের সহপাঠী 'হাজু'। যে অনেক অনেক বছর আগে নিজের জলপানির টাকা তুলে দিয়েছিল হলধরের হাতে। সেই টাকা দিয়ে মফস্‌সল শহরে একটা ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন [illegible] বাহুল্য জীবনে প্রথম সম্পাদনার কাজ সেই পত্রিকায়। পত্রিকার একটা সংখ্যা প্রকাশের পরই বাবার কলকাতায় বদলি হওয়ার সূত্রে কলকাতায় আসা আর [illegible] বড়া হয়ে ওঠা। সেই ফেলে আসা জীবনের আর কারোর সঙ্গে [illegible] রাখতে পারেননি হলধর।

দপ্তরে এসে চুপচাপ বসেছিলেন হলধরবাবু। কেউ যেন আজ তাঁকে ডিস্টার্ব না করে, সবাইকে বলে দিয়েছেন। বারবার মনে আসছে নিশিকান্তর কথা। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর, বেয়ারাকে গত সাত দিনের দৈনিক 'হইচই' আনতে বললেন। কলকাতায় থাকলে প্রত্যেক দিনের পত্রিকায় কোনো ত্রুটি আছে কি না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয় তাঁকে।

বেয়ারা এসে কাগজগুলো দিয়ে গেল। দেখতে শুরু করলেন তিনি। পত্রিকা দেখতে দেখতে ছোট্ট একটা সংবাদে চোখ আটকে গেল তার। সংবাদের শিরোনাম 'বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু'। তাতে লেখা হয়েছে—নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসাত গতকাল রাত দশটা নাগাদ নীলগঞ্জের কাছে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মৃতের আনুমানিক বয়স ষাট বছর। মৃতের কাছ থেকে একটা কাগজ পাওয়া গেছে।

BanglaBook.org

তার থেকে পুলিশের ধারণা মৃতের নাম সম্ভবত নিশিকান্ত হাজরা। মৃতের ঠিকানা পুলিশ অনুসন্ধান করছে। সনাক্তকরণ চিহ্ন হিসাবে তার বাঁ-গালে একটা বড়ো আঁচিল আছে। ধৃত বাস ড্রাইভারের বয়ান অনুযায়ী বৃষ্টির মধ্যে বাস থামানোর জন্য হঠাৎই চলন্ত বাসের সামনে চলে আসেন তিনি। তাঁর থেকে এই দুর্ঘটনা। হলধরবাবুর সামনে সব কিছু যেন টলে উঠল। টেবিলের ওপর ঢলে পড়লেন তিনি।

প্রায় এক মাস পর হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন হলধরবাবু। তাঁর অসুস্থতার কারণে সেবার পুজোর সংখ্যা ছাপতে একটু দেরি হল। তবে তার সূচিপত্রে যে গল্পটির নাম প্রথম ছাপা হয়েছিল তা হল 'আঁধার রাতের বন্ধু' লেখকের নাম—নিশিকান্ত হাজরা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG